বিলু
সন্তু ও
বাচ্চুকে—

সম্প্রতি গ্রহান্তর অভিযান বিষয়ে নানাদেশের বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়েছেন, এবং অচিরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু এ-বিষয়েও যে জুল ভার্ন বহুকাল আগে তাঁর প্রবচনীয় বাচনকলায় একটি বিজ্ঞান-নির্ভর অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাস লিখেছিলেন, এখন সে-কথা এই কারণেই বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর 'নটিলাস' আজ আর স্বপ্ন নয়, উড়োজাহাজও এখন সত্যি জিনিস; আর হাউই-সংবলিত আকাশ-যানের পূর্বকল্পনাও তিনি করেছিলেন। এ আশা করা নিশ্চয় অন্যায় নয় যে, যাঁর হাতে অ্যাডভেঞ্চার-উপন্যাসও ক্ল্যাসিক হয়ে উঠেছিলো, সেই তাঁর গ্রহান্তর অভিযানের কাহিনীও একদিন তাঁর অন্যান্য কল্পনার মতো সফল হবে।

এই অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছে ইংরিজি সংস্করণ অনুযায়ী, এবং কাগজের দুর্মূল্যতা-হেতু কলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে মূল কাহিনীটুকু ও রচনাভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখে ঈষৎ সংক্ষেপনের প্রয়োজন পড়েছে। কিন্তু তবু ছোটোরা এ-বই পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশক

প্রথম খণ্ড

১

অক্টোবর মাসের তিন তারিখের সন্ধেবেলায় আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে সুবিখ্যাত গান-ক্লাবের বড়ো হলঘরটায় একটা সভা বসেছিলো। বাইরে রাত্রির কুয়াশা নেমেছে একটু-একটু ক'রে, আর নামছে অন্ধকার। লোকজনের চলাফেরা এর মধ্যেই অল্প হ'য়ে এসেছে। কিন্তু সেই সভায় হাজির হয়েছিলো অনেক লোক, এবং তাদের সকলেই গান-ক্লাবের সভ্য। সমাগতদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো সাধারণ, এবং তা সহজেই চোখে পড়ে; তাদের কারো শরীরই আস্ত ছিলো না। কারো-বা হাত আছে, একটি পা নেই; কারো-বা পা দুটো সম্পূর্ণ আছে কিন্তু হাত দুটি অদৃশ্য; আবার কারো-কারো হাত-পা দুইই আছে, কিন্তু একটি চোখ কি একটি কান নেই। কারো-বা কাঠের হাত, কারো-বা কাঠের পা, কারো-কারো পাথরের চোখ। অর্থাৎ সভায় যতোজন লোক হাজির হয়েছিলো, তাদের কারুরই শরীর নিখুঁত নয়, কোনো-না-কোনো অঙ্গহানি হয়েছেই।

'গান-ক্লাব'-এর যারা সভ্য, তাদের একমাত্র কাজই ছিলো কামান, বন্দুক, গোলা-বারুদ তৈরি করা। সম্মেলনের নামটা 'গান-ক্লাব' সে-জন্যেই। সভ্যরা সবাই ওস্তাদ গোলন্দাজ, এবং সেই হিশেবেই তাদের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কেমন ক'রে কামান তৈরি করলে বড়ো-বড়ো একেকটা গোলাকে বহুদূরের পাল্লায় প্রেরণ করা যায়, কী করলে সেই দূর-পাল্লার কামানের গোলা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেক জায়গা ধ্বংস ক'রে ফেলতে

পারে, 'গান-ক্লাব'-এর সুবিখ্যাত সভ্যদের তা-ই ছিলো একমাত্র বিষয়। কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদ—এ-সব অস্ত্রশস্ত্রের জোর পরখ করতে গিয়েই তারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারাতো। কিন্তু তাই ব'লে তারা কখনো আপশোশ করতো না, বরং তা-ই যেন তাদের প্রতিভার সোনালি প্রতীক হ'য়ে উঠেছিলো। কী করলে ধ্বংসের বাজনা আরো জোরে বাজানো যায়, কেমন ক'রে আরো অনেক বেশি মানুষ মারা যায়, তার নতুন কোনো পরিকল্পনায় সাফল্য লাভ করতে পারলেই তারা ভাবতো মানব জন্ম সার্থক হ'য়ে গেলো।

কিন্তু 'গান-ক্লাব'-এর সভ্যদের সামনেও একদিন দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। যে-সব যুদ্ধ চলেছিলো, হঠাৎ সে-সব গেলো থেমে। পৃথিবীর সকল মানুষই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো: 'শান্তি চাই'। এবং, আশ্চর্য হবার মতো বিষয় হ'লেও, সত্যই একদিন পৃথিবীর উপর থেকে সমস্ত যুদ্ধ থেমে গেলো। 'শান্তি স্থাপিত হোক সর্বত্র' —এ-কথায় কারোই আপত্তি ছিলো না, কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন একদিন যুদ্ধ থেমে গেলো, 'গান-ক্লাবের' সভ্যদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো। তাদের মনে হ'লো সর্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে, আর তো গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুকের ব্যবহার ঘটবে না; আর তাহ'লে এ-সব অস্ত্রের উন্নতি হচ্ছে, না অবনতি হচ্ছে, সেই তথ্য কী ক'রে অবগত হওয়া যাবে? কেল্লায় স্তূপীকৃত হ'য়ে প'ড়ে রইলো গোলা-বারুদ; একদিন যে-সব কামান-বন্দুকের চকচকে ইস্পাত রোদে ঝিলকিয়ে উঠতো, মরচে প'ড়ে গেলো সে-সবে, গোলন্দাজেরা আলস্যে শরীরে বাত হ'তে দিলো। একদিন যেখানে কামানের গোলায় মাঠে-মাঠে হাজার-হাজার ছোটো-বড়ো গর্ত হয়েছিলো সেখানে জ'মে গেলো মাটি, চাষীরা ফুর্তিতে নানারকম ফসল ফলাতে শুরু করলো। সভ্যরা চোখের সামনে দেখতে লাগলো তাদের সমস্ত কীর্তিকলাপ বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে। ইতিহাসের

তথ্যাদিলপ্, কোনো অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ছাড়া তাদের ক্লাবের নাম কেউ আর বিশেষ জানতে চায় না। এমনকি আমেরিকার সব-সময়-লেগে-থাকা গৃহযুদ্ধগুলোও যখন বন্ধ হ'য়ে গেলো তখন 'গান-ক্লাব'-এর সদস্যরা চোখের সামনে দেখলো চাপ-বাঁধা জমাট অন্ধকার: তাদের মাথায় যেন আচমকা আকাশ ভেঙে পড়লো। ক্লাবের বড়ো হল-ঘরটায় সভ্যদের ভিড় আর হ'তো না, কোনো সভা বসতো না, নতুন-কোনো মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রে প্রায়ই তারা যে-উল্লাসধ্বনি তুলতো, তা-ও আর শোনা যেতো না। কেনই বা আর ভিড় হবে, সভাই বা বসবে আর কী জন্যে, আর নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ক'রেই বা আর কী লাভ? ক্লাবের দু-চারজন মাথাওলা সদস্য ছাড়া আর-কেউ ঐ ধারই মাড়াতো না আর। দেশি-বিলিতি কতো পত্র-পত্রিকা টেবিলের উপর প'ড়ে থাকতো, কিন্তু একটারও প্যাকেট খুলে দেখতো না কেউ।

তবে অক্টোবরের তিন তারিখে অকারণেই অনেকদিন পরে বহু সভ্য জমায়েত হয়েছিলো। ঘরের কোনায় চুল্লির ঘুলঘুলি আবার অনেকদিন পরে দাউ-দাউ আগুনের টকটকে লাল আভা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। সেই আগুনের আঁচে হাত সেঁকতে-সেঁকতে হান্টার ক্ষোভের সুরে বললেন, 'আমাদের কী-রকম দুর্দিন পড়েছে, দেখেছো! একেবারে যে কুড়ের বাদশা হ'য়ে যাচ্ছি আস্তে-আস্তে! অথচ এমন দিনও ছিলো, যখন ঘুম ভাঙতো কামানের গর্জনে, আবার ঘুমিয়েও পড়তুম কামানের নির্ঘোষ শুনতে-শুনতে। হায়রে সে-দিন! জীবনটা অসহ্য হ'য়ে উঠলো! আর কি সে-দিন আসবে?' সময় এবং নদীর জলের চ'লে যাবার কথা বলতে-বলতে হান্টার উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন; তাঁর কাঠের পা-খানা যে চুল্লির আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল না-ক'রেই চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ইচ্ছে করে যারা শান্তি এনেছে, সেইসব লোকগুলোকে একবার মুখোমুখি দেখি!'

বিল্‌স্‌বি বললেন, 'হুঁ! আর সে-দিন আসবে! খ্যাপা না পাগল! সে-সব দিনগুলো তো স্বপ্ন! আগে একটা কামান তৈরি হ'তে-না-হ'তেই তার পরীক্ষা শুরু হ'তো। তারপর যেই শিবিরে ফিরেছি, অমনি বন্ধুদের সে কী হৈ-চৈ! আবার কামান একদিন একটু বেশি মানুষ মারতে পারলে তাদের কী উল্লাস! অমনটি আর হয় না, হবেও না!'

ক্লাবের সেক্রেটারি ম্যাটসন তাঁর প্ল্যাস্টিকের তৈরি ডান হাতের তালু চুলকোতে-চুলকোতে ক্ষোভের স্বরে বললেন, 'বরাত! সবই বরাত! ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ বাধবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আজ সকালে বেকার ব'সে থাকতে-থাকতে শেষ পর্যন্ত একটা নতুন ধরনের কামানের নকশা এঁকে ফেলেছি। শুধু নকশা নয়, মায় মাপ, ওজন সব। এ যদি ব্যবহার করতে পারা যেতো তাহ'লে দেখতে যুদ্ধের ধারাই একেবারে বদলে গেছে।'

কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বি চশমা খুলে তাঁর পাথরের বাঁ-চোখ রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'তাই না কি হে?'

'নিশ্চয়ই!' ম্যাটসন বললেন, 'এই তো, ত্থাখো না নকশাটা। কিন্তু কী-ইবা লাভ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে! এ দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমেরিকার লোক তো আর যুদ্ধ করবে না!'

কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বি বললেন, 'তার চেয়ে চলো আমেরিকা ছেড়ে য়ুরোপে চ'লে যাই। তারা তো আর আমেরিকান নয়, একটু উশকে দিতে পারলেই হ'লো, সঙ্গে-সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে।'

হাণ্টার অবাক হ'য়ে শুধোলেন, 'তাতে আমাদের কী হবে?'

'কী হবে মানে? তাদের হ'য়েই না-হয় কামান বানাবো। মানুষ মারার কল তৈরি তো? সে যেখানে-সেখানে করলেই হ'লো। রক্তের রঙ তো সব জায়গাতেই লাল! তা ছাড়া এতে আমাদের কাজও হবে, কোনো আমেরিকানও মরবে না।'

'ধেৎ, তা-ই কি হয়?' হাণ্টার বললে, 'ইয়াঙ্কি হ'য়ে কি-না বিদেশীর জন্ম কামান বানাবো!'

ব্লুম্‌স্‌বি চ'টে উঠে বললেন, 'কিছু না-করার চেয়ে তো ভালো। কুড়ের মতো ব'সে থাকতে-থাকতে যেটুকুও জানতুম, তা-ও ভুলে-যাবার জোগাড়।'

ম্যাটসন বললেন, 'না হে কর্নেল, তোমার ঐ বিদেশে—বিশেষ ক'রে য়ুরোপে—যাবার আশা ছাড়ো। জাতীয় উন্নতি কিসে হয়, সে-সব বুঝতে তাদের এখনো যথেষ্ট দেরি! কোথায় আমেরিকা, আর কোথায় য়ুরোপ! আমেরিকার সঙ্গে তাদের কিছুতেই বনবে না।'

হাণ্টার করুণভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'তাহলে আর কী: চলো, এখন লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে যাই, আর না হলে তিমি মাছ ধ'রে তার চর্বিটা নিয়ে চুল্লিতে চাপাই! হুঁ! যত্তোসব হ্যানো-ত্যানো!'

ম্যাটসন একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, 'অতোটা আর করতে হবে না হে। চিরদিনই কি আর শান্তিতে কাটবে? দ্যাখোনা, দু-দিনেই যুদ্ধ লেগে যাচ্ছে। ফ্রান্স কি ভুল ক'রেও আমাদের দু-এক-খানা জাহাজ আটকে রাখবে না? ইংল্যাণ্ড কি আর দু-চারজন ইয়াঙ্কি খুনেকে ফাঁসিতে লটকাচ্ছে না? দ্যাখো না, একটা যুদ্ধ বাঁচলো ব'লে। কেবল একটা সুযোগের অপেক্ষা মাত্র।'

'কিন্তু, ম্যাটসন, তুমি এ-তথ্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন যে, আমেরিকার চামড়া এখন মোষের মত পুরু হয়েছে। ছুঁচের ঘা আর লাগছে না। তোমার ঐ আশায় ছাই দাও। আমরা কি আর মানুষ আছি! গোল্লায় গেছি, একেবারে গোল্লায় গেছি! নইলে কি আর এতো-দিনেও ছোটোখাটো একটা যুদ্ধ বাধে না?'

ব্লুম্‌স্‌বি বললেন, 'একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে কী-রকম হয়?'

'কেমন ক'রে বাধাবে? কারণ কই যুক্তিসংগত?'

'কারণ ?' ব্লুমস্‌বি বললেন, 'কারণের আবার অভাব ? এই ছাখো না—আমেরিকা কি একদিন ইংরেজদের ছিলো না ?'

'ছিলো বৈ কি। কিন্তু তাতে কী ?'

'তাতে কী ? তাহ'লে ইংল্যাণ্ডই বা আমাদের দেশ হবে না কেন ?'

বিল্‌স্‌বি তাঁর ভাঙা দাঁত কিড়মিড় ক'রে বললেন, 'হুঁ! যাও না একবার প্রেসিডেন্টের কাছে, মজাটা টেব পাইয়ে দেবেন! আমি কিন্তু এবার আর ওঁকে ভোট দেবো না!'

'কে দেবে ?' হাণ্টার বললেন, 'ঐ গোবেচারা কুনো লোকটাকে আবার কে ভোট দেবে ? আমি তো দিচ্ছি না!'

তখন সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হ'লো, আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্টকে আর কেউ কখনো ভোট দেবে না। এমন সময় উত্তেজিত সভ্যরা দেখলো ক্লাবের বেয়ারা এসে চেঁচিয়ে একটা নোটিশ পড়ছে :

'গান্‌-ক্লাবের সভাপতি মিঃ ইম্পে বার্বিকেন সবিনয়ে সকল সদস্যকে জানাচ্ছেন যে, আগামী পাঁচই অক্টোবর সন্ধে আটটার সময় তিনি সভ্যদের এক আশ্চর্য খবর শোনাবেন। মিঃ বার্বিকেন আশা করেন যে সকল সদস্যই সমস্ত কাজ ফেলে সেদিন সভায় হাজির হবেন। প্রত্যেককে আবাব জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে সেদিনকার সভার বিষয় ভীষণ জরুরি।'

২

পাঁচই অক্টোবর বিকেলবেলাতেই গান-ক্লাবের মস্ত হলঘরটায় লোক আর ধরে না। ত্রিশ হাজারেরও বেশি সদস্য গান-ক্লাবের। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় প্রত্যেক ট্রেনে সদস্যরা আসতে লাগলো। অতো বড়ো হলঘরটায় পর্যন্ত আর তিলধাবণের জায়গা রইলো না। শেষে রাস্তার মোড়ে মোড়ে পর্যন্ত হাজার-হাজার উত্তেজিত লোক অপেক্ষা করতে লাগলো। ক্লাবের ফটকে বসলো দরোয়ান: সমিতিব সদস্য ছাড়া আর-কারো ভিতরে ঢোকা নিষিদ্ধ ক'রে দেয়া হ'লো।

ক্লাবের বিরাট আলো-উজ্জ্বল ঘরেব এককোণায় একটা উঁচু মঞ্চের উপর সভাপতিব আসন নির্দিষ্ট ছিলো। সেই আসন বানানো হয়েছিলো কামান-বওয়া গাড়িব উপব। আসনের সামনে টেবিল, আর টেবিলের সামনে সদস্যদের বসবার জন্যে গ্যালারি বানানো হয়েছিলো।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ধীর, সুস্থির, গম্ভীর মানুষ। তাঁর প্রত্যেক কাজ চলতো ক্রনোমিটাবের কাঁটার মতো। অন্যের কাছে যে-কাজ অকল্পনীয় ও দুঃসাধ্য, বার্বিকেন তা অবলীলাক্রমেই করতে পারতেন। সমিতির সভ্যবৃন্দের মধ্যে শুধু-কেবল তাঁরই দেহ নিখুঁত ছিলো। অথচ তাঁর মতো নিত্য-নতুন গোলা-বারুদ-কামান-বন্দুক আবিষ্কার করতে কেউ পারেনি।

আটটা বাজতে যখন দেড় মিনিট বাকি, তখন কালো রেশমের একটা টুপি মাথায় দিয়ে বার্বিকেন মঞ্চে উঠলেন। ঘড়িতে যেই আটটা বাজার প্রথম ঘণ্টা বাজলো—ঢং, তখনি বার্বিকেন চেয়ার ছেড়ে উঠে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আমার বীর সহযোগিবৃন্দ! আমাদের সুবিখ্যাত গান-ক্লাবের সদস্যরা আজ পরম অকর্মণ্যতার

মধ্য দিয়ে যে-জীবন কাটাচ্ছেন তা সত্যিই দুর্বহ। হঠাৎ যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সমস্ত যুদ্ধ থেমে আপোশ-রফা হ'য়ে যাবে, তা কে জানতো! এবং এই আপোশ যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা ছিলো সকলেরই স্বপ্নের অগোচর। অথচ প্রতিটি সেকেণ্ডে নতুন যুদ্ধের প্রতীক্ষায় কাটিয়ে এতোদিনে আমরা এই তথ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে অচিরকালের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা নেই। আমরা কি তবে চুপ ক'রে ব'সে থাকবো? কামান-বন্দুক গোলা-বারুদের আর কি কোনো উন্নতি হবে না?

'আমি আপনাদের জিগেস করি, আর যদি যুদ্ধ না-ই হয়, তাহলে কি আমবা মূর্খের মতো নিশ্চেষ্ট তাকিয়ে থেকে প্রমাণ ক'রে দেবো যে আমরা এই উনবিংশ শতাব্দীর অযোগ্য? আমি জিগেস করি, পৃথিবীখ্যাত গান-ক্লাব কি আজ তার সম্মান রাখবার জন্যে নতুন ধরনের কোনো বিশেষ কাজে লাগতে পারবে না?'

হাজার-হাজার গলা চেঁচিয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ! গান-ক্লাব নতুন কোনো কাজ করতে চায়!'

বার্বিকেন ব'লে চললেন, 'বন্ধুগণ! আমি অনেক ভেবে দেখেছি, গান-ক্লাব এখন এমন একটা কাজে হাত দিতে পারে, যা শুধু এই গান-ক্লাবেরই সাজে, যা শুধু আমেরিকারই মানায়। দুনিয়াশুদ্ধ লোক সে-কথা শুনলে অবাক হ'য়ে যাবে।'

এখানে হাজার কণ্ঠের ধ্বনি উঠলো: 'কী? কী? সে-কাজ কী?'

'আপনারা মন দিয়ে আমার কথা শুনুন। সে-কথা বলবার জন্যেই আজ এই সভার আয়োজন ক'রে আপনাদের ডেকে আনা হয়েছে। আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, আপনারা সকলেই পৃথিবীব উপগ্রহ চন্দ্রকে দেখেছেন। আমরা সেই চন্দ্রলোকে অভিযান চালাতে চাচ্ছি: চন্দ্রলোক আবিষ্কার ক'রে আমরা নতুন কলম্বাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে চাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য এখন ছত্রিশটি: গান-ক্লাব তার সাধ্য প্রয়োগ ক'রে আরেকটি

নতুন রাজ্য তার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। চন্দ্রলোকও আমাদের অধিকারে আসবে।'

উল্লাসে গান-ক্লাবের সদস্যরা এতো জোরে চেঁচিয়ে উঠলো যে মনে হ'লো ঘরের ছাদ যেন ভেঙে পড়লো।

'বন্ধুগণ,' বার্বিকেনের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, 'আপনারা জানেন যে চন্দ্রলোক নিয়ে প্রচুর আলোচনা হ'য়ে গেছে। চাঁদের গুরুত্ব, ঘনত্ব, অবস্থা, গতি, গঠনপ্রণালী, দূরত্ব—সব কিছুই আজ আমরা জানি। এই সৌর জগতে চাঁদ কী কাজ করে, তা-ও আমাদের জানতে বাকি নেই। আপনারা হয়তো চাঁদকে নিয়ে লেখা অনেক গল্প-কল্প পড়েছেন, চন্দ্রলোকে যাবার অনেক পরিকল্পনার কথা শুনেছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত সে-কাজে কেউই সাহস ক'রে এগিয়ে আসতে পারেননি। কাজেই চন্দ্রলোক এখনো অনাবিষ্কৃত বললে ভুল বলা হয় না। সেই অজানা সাম্রাজ্য আবিষ্কার ও অধিকার ক'রে আমরাই হবো পৃথিবীর'—সভ্যদের তুমুল হট্টগোলে আর-কিছু শোনা গেলো না। কিছুক্ষণ বাদে যখন উত্তেজনা একটু কমলো, তখন বার্বিকেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন এ অসম্ভব। কিন্তু মোটেই না—বরং খু-ব সোজাই বলা যায়। গত কয়েক বছরে কামানের ক্ষমতা কতো বেড়েছে, কতো দূর পর্যন্ত তার গোলার পাল্লা, তাছাড়া বিস্ফোরকেরও কতোটা উন্নতি হয়েছে, তা বোধ করি আপনাদের ব'লে দিতে হবে না। নিঃসন্দেহে আপনারা জানেন দক্ষ লোকের কাছে বারুদ কতো জোর পায়, কামানের পাল্লা কতোটা বাড়ে। সেই কারণেই আমি ভাবছিলাম, চন্দ্রলোকে আমাদের কামানের একটি গোলা ফেলতে পারলে দোষ কী? তাতে আমাদের কামানের পাল্লাও পরখ ক'রে নেয়া যাবে, চাঁদের দেশও দখল ক'রে নেয়া হবে।'

অন্ধকার রাত্রে চলতে-চলতে বিদ্যুতের আলোয় সামনে উদ্যত-ফণা সাপ দেখলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে, বার্বিকেনের এই

প্রস্তাব শুনে ক্লাবের সদস্তরা খানিকক্ষণ তেমনি মুহ্যমান হ'য়ে রইলো। কিন্তু সম্বিত ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে যে-উল্লসিত চিৎকার উঠলো, তাতে মস্ত হলঘরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। বার্বিকেন আবার কথা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সম্ভব হ'লো না। এই সোরগোলের মধ্যে কোনো কথা বলবার চেষ্টা করা বাতুলতা। খানিকক্ষণ বাদে সদস্যরা যখন একটু শান্ত হ'লো, তখন বদ্ধ হলঘর আবার গমগম ক'রে উঠলো বার্বিকেনের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে, 'আমার আরেকটা কথা বলবার আছে। আমি এ ক-দিন ভালো ক'রে হিশেব ক'রে দেখেছি, সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারে এমন একটা গোলা যদি চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া যায়, তাহ'লেই তা চাঁদে পৌঁছুবে। তাই আপনাদের কাছে আমার সবিনয় আবেদন যে- আপনারা আপাতত কুঁড়ের মতো ব'সে না-থেকে এই সামান্য কাজটায় একটু মনোনিবেশ করুন।'

৩

গান-ক্লাবের সভাপতি বার্বিকেন যখন ক্লাবের হলঘরে বক্তৃতা করছিলেন, তখনি প্রত্যেকটি শব্দ টেলিগ্রাম ক'রে ওয়াশিংটনে, ফিলাডেলফিয়ায়, নিউইয়র্কে, বোস্টনে পাঠানো হচ্ছিলো। সারা আমেরিকা যখন বার্বিকেনের পরিকল্পনা জানতে পারলো, তৎক্ষণাৎ উৎসব শুরু হ'য়ে গেলো। শহরে-শহরে শোভাযাত্রা বেরুলো, নাচ-গানের কলরব শুরু হ'লো, বন্যা ব'য়ে গেলো শ্যাম্পেনের: সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রে যেন শুরু হ'লো জাতীয় উৎসব।

রাস্তায় ঘাটে, দোকানে সরাইয়ে, রেস্তোরাঁয় কফিখানায়, আপিশে বন্দরে—যেখানেই দু-জন লোক মুখোমুখি হ'লো, অমনি শুরু হ'লো চাঁদের কথা। আমেরিকার হাজার-হাজার খবর-কাগজে চাঁদের দেশে কামানের গোলা পাঠানো সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হ'য়ে গেলো। কেউ সামাজিক, কেউ রাজনৈতিক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ-বা দার্শনিক, আবার কেউ-কেউ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বার্বিকেনের প্রস্তাবটি বিচার করলো। আর শেষকালে সবাই একটি কথাই বললে যে, গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন অসম্ভব কিছুই বলেন নি, আমেরিকানরা সবকিছুই পারে, আর এইজন্যেই আমেরিকা ও য়ুরোপে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ইম্পে বার্বিকেন তাঁর নতুন প্রস্তাবে সারা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল সোরগোল সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাবলেশহীন মুখে উত্তেজনার কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। লোকে যখন কল্পনায় চাঁদের দেশে নিত্য-নতুন অভিযান চালাচ্ছে, তখন বার্বিকেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে চাঁদের দেশে যাবার পথ ঠিক করছিলেন।

কেম্ব্রিজ মানমন্দির পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং ভালো অবজারভেটরি ব'লে সুনাম অর্জন করেছিলো। সেখান থেকে বার্বিকেন এক চিঠি পেয়ে জানলেন যে প্রতি সেকেণ্ডে যদি কোনো গোলা বারো হাজার গজ যেতে পারে তাহ'লে অনায়াসেই তা চাঁদে পৌঁছুবে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাহ'লে আর সে-গোলার উপর খাটবে না, অভিকর্ষ তাকে আর পৃথিবীতে টেনে নামাতে পারবে না। চলতে-চলতে গোলাটা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে চাঁদের আকর্ষণের জোর হ'য়ে উঠবে বেশি, আর তার ফলে গোলাটা আরো বেগে চাঁদের দিকে চ'লে যাবে। গোলাটি যদি বরাবর সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ যেতে পারতো তাহ'লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা চাঁদে পৌঁছতে পারতো। কিন্তু তা তো আর হবে না! মাধ্যাকর্ষণ আছে, বাতাসের বাধা আছে ; এবং এর ফলেই আস্তে-আস্তে তার গতি কমতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক ক'ষে বললেন, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ শেষ হ'য়ে চাঁদের আকর্ষণ শুরু হয়েছে সেখানে পৌঁছতে গোলার লাগবে তিরাশি ঘণ্টা বিশ মিনিট। আর সেখান থেকে চাঁদে পৌঁছতে লাগবে আরো তেরো ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট কুড়ি সেকেণ্ড।

তোমরা জানো, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। হ্যাঁ, ঘোরে তো নিশ্চয়ই. তবে, বৃত্তাকারে নয়। ঘুরতে-ঘুরতে যখন পৃথিবী থেকে চাঁদ সবচেয়ে দূরে স'রে যায়, তখন সে-দূরত্ব হয় দুশো সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো বাহান্ন মাইল। আর যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখনো পৃথিবী থেকে চাঁদ আঠারো হাজার ছ-শো মাইল দূরে থাকে। কাজেই চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসে তখনি কামান ছোঁড়বার ঠিক সময়, এবং তাতে সুবিধেও অনেক।

প্রত্যেক মাসেই চাঁদ একবার ক'রে পৃথিবীর খুব কাছে আসে, কিন্তু সকল মাসেই জেনিথ ছাড়িয়ে আসে না। অনেক বছর পর

পর চাঁদ এ-ভাবে পৃথিবীর খুব কাছে আসে। বিজ্ঞানীরা বার্বিকেনকে জানালেন যে, আগামী বছর ডিসেম্বরের চার তারিখে রাত্রি দ্বি-প্রহরে অনেক বছর পরে চাঁদের এই অবস্থা ঘটবে। তার আগে পয়লা ডিসেম্বর রাত দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময় চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়তে হবে। এ-ই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, কারণ তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব আরো কয়েক মাইল ক'মে যাবে। ঠিক ঐ সময়ে কামান ছুঁড়তে না-পারলে আঠারো বছর এগারো দিনের আগে চাঁদ আর এই পৃথিবীর নিকটতম জায়গায় আসবে না। আর, কামান ছুঁড়তে হবে দক্ষিণ বা উত্তর অক্ষ-রেখার শূন্য ডিগ্রি থেকে আটাশ ডিগ্রির মধ্যকার কোনো জায়গা থেকে; না-হ'লে অন্য-কোনো জায়গা থেকে যদি কামান ছোঁড়া হয় তবে তার গতি আস্তে-আস্তে বেঁকে গিয়ে গোলাকে চাঁদ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা আরো বললেন যে, চাঁদ প্রত্যেক দিন তেরো ডিগ্রি দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড পথ চলে। চাঁদ যখন জেনিথ থেকে চৌষট্টি ডিগ্রি দূরে থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে কামান ছুঁড়তে হবে।

এ-সব বিষয় যখন ঠিক হ'য়ে গেলো, তখন গান-ক্লাবের সভ্যবৃন্দ একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হলেন। সেই বৈঠকে ঠিক হ'লো, লোহার বা পিতলের গোলা হ'লে চলবে না, কারণ তাহ'লে গোলা অসম্ভব ভারি হ'য়ে যাবে; কেবল-মাত্র অ্যালুমিনিয়ামের গোলা হ'লে এই মারাত্মক ওজনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। আর ঐ গোলার ব্যাস করতে হবে নয় ফুট, কারণ আয়তন তার চেয়ে কম হ'লে সব-সেরা দূরবীনেও গোলাটা দেখা যাবে না। গোলাটা ফাঁপা করতে হবে; চাই-কি, তার ভিতর পৃথিবীর দু-চারটে জিনিশের নমুনাও পাঠিয়ে দেয়া যাবে। ন-ফুট ব্যাসের ফাঁপা গোলাটার ওজন হবে দুশো চল্লিশ মণ পঁচিশ সের। কিন্তু গোলাটা যদি লোহার হয়, তাহ'লে তার ওজন সেখানে হবে

আটশো তেতাল্লিশ মণ। তাই সকলে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অ্যালুমিনিয়মের গোলাই বানানো হবে। হিশেব ক'রে গোলা বানাবার সম্ভাব্য ব্যয় দেখা গেলো পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশো একাশি টাকা।

গোলাটা কী-ধরনের হবে, কী-রকম হবে, সব যখন ঠিক হ'লো তখন এলো ঐ বিপুল ওজনের ন-ফুট চওড়া গোলা ছোঁড়বার উপযোগী কামানের কথা, আর এ-প্রশ্নও সঙ্গে-সঙ্গে এলো, কী ক'রে ঐ গোলার গতি সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ করা যায়।

শূন্যে একটি গোলা ছুঁড়লে যে-বায়ুস্তর ভেদ ক'রে সেটা এগিয়ে চলে সেই বায়ু তাকে বাধা দেয়, মাধ্যাকর্ষণও তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করে; তবুও সেটা এগিয়ে চলে বারুদের জোরে যে-বেগ পায় তার সাহায্যে। পৃথিবীর চল্লিশ মাইল উপরে আর বায়ুস্তর নেই, কাজেই যে-গোলা সেকেণ্ডে বারো হাজার গজ ছুটবে, সে অবিলম্বেই বায়ুস্তর পেরিয়ে যাবে ব'লে কয়েক সেকেণ্ড পর আর বায়ুস্তর কাটাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তখনো মাধ্যাকর্ষণের কথা থাকে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী রচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞান বলছে যে, একটি জিনিশ যতোই উপরে উঠবে তার ওজনও ততোই দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে কমতে থাকবে। গোলার বেগ বাড়াতে পারলেই মাধ্যাকর্ষণ অনায়াসে কাটিয়ে নেয়া যাবে। সেই বেগ নির্ভর করে কামানের দৈর্ঘ্য আর বারুদের জোরের উপর। তার মানেই হ'লো কামানটা খুব বেশি লম্বা করতে হবে, কারণ কামানের নলচে যতোই লম্বা হবে, গোলার পিছনে বারুদের গ্যাস ততোই বেশি জমবে, এবং সেই কারণেই গোলার গতিবেগও বাড়বে।

বার্বিকেন হিশেব ক'রে জানালেন যে, এই কাজের জন্য চল্লিশ হাজার মণ বারুদের প্রয়োজন হবে। এ-কথা শুনে ক্লাবের সদস্যরা অবাক হ'য়ে গেলেন, কেননা চল্লিশ হাজার মণ বারুদে বাইশ হাজার ঘন-ফুট জায়গা জুড়বে। তারপর বারুদের গ্যাসেরও জায়গা

তাই, জায়গা চাই গোলাটা রাখবার ; তার মানে কামান হবে কয়েক হাজার ঘন-ফুট লম্বা। কিন্তু বার্বিকেন তখন জানালেন যে কামান হবে ন-শো ফুট লম্বা, ব্যাস ন-ফুট, পুরু ছয় ফুট, এবং তার ওজন হবে উনিশ লক্ষ পনেরো হাজার দুশো মণ, আর বানাবার খরচ পড়বে এগারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশো কুড়ি টাকা।

গান-ক্লাবের সেক্রেটারি ম্যাটসন বললেন, 'চল্লিশ হাজার মণ বারুদে জায়গা জুড়বে বাইশ হাজার ঘন-ফুট। ন-শো ফুট লম্বা ন-ফুট ব্যাসের কামানে অল্পবিস্তর চুয়ান্ন হাজার ঘন-ফুট জায়গা আছে। তার প্রায় অর্ধেক জায়গাই যদি বারুদ রাখতে লেগে যায়, তাহ'লে বারুদের গ্যাস কোথায় থাকবে? গোলাটা তো তাহ'লে চলবেই না।'

অবিচলিত স্বরে বার্বিকেন বললেন, 'আপনারা জানেন, গাছ লতা পাতায় অগুন্তি কোষ আছে। তুলোয় এই কোষ আছে সব-চেয়ে বেশি। উত্তপ্ত নাইট্রিক অ্যাসিডে পনেরো মিনিট তুলো ভিজিয়ে শুকিয়ে নিলেই পৃথিবীর সবচেয়ে তীব্র বিস্ফোরক তৈরি হ'য়ে গেলো। বারুদ জ্বলে দুশো চল্লিশ ডিগ্রি গরমে, আর এই তুলো জ্বলবে একশো সত্তর ডিগ্রি উষ্ণতায়। তা ছাড়া এই তুলোর শক্তি হবে সাধারণ বারুদের চারগুণ বেশি। যতোটা তুলো লাগবে তার চার-পঞ্চমাংশ নাইট্রেট-অব-পটাশ তুলোর গায়ে লাগিয়ে দিলে গ্যাসের প্রসারণ-শক্তি যাবে আরো অনেক বেড়ে। তার মানে চল্লিশ হাজার মণ বারুদের বদলে আমাদের লাগবে মাত্র পাঁচ হাজার মণ তুলো। চাপ দিলে ছ-মণ দশ সের তুলোকে সাতাশ ঘন-ফুটের ভিতরে রাখা যায়। কাজেই আমাদের যতোটুকু তুলো লাগবে, তা অনায়াসেই একশো আশি ঘন-ফুটের মধ্যে রাখা যাবে। তার মানে হচ্ছে, আমাদের ন-শো ফুট লম্বা কামানে প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাব হবে না।'

তার পরে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর প্রথম ঠিক করা হ'লো

যে, হয় টেক্সাস নইলে ফ্লোরিডা—এই দু-জায়গার কোনো-এক এলাকা থেকেই চাঁদে গোলা পাঠানো হবে। তখন টেক্সাস আর ফ্লোরিডায় ঝগড়া বেধে গেলো। টেক্সাস বললে, 'আমিই চাই চাঁদের দেশে পৃথিবীর প্রথম গোলা পাঠানোর গৌরব', আর অমনি ফ্লোরিডা রেগে উঠে বললে, 'তার মানে! চাঁদের সঙ্গে প্রথম আত্মীয়তার জয়মাল্য আমারই প্রাপ্য।' টেক্সাসের লোকেরা দল বেঁধে বাল্টিমোরে এলো বার্বিকেনের সঙ্গে দেখা করতে, ফ্লোরিডা থেকেও অগুন্তি লোক এলো গান-ক্লাবে। দু-দলের তর্ক শুনতে-শুনতে সভ্যদের কান ঝালাপালা হ'য়ে গেলো, মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করতে লাগলো, কানের পর্দা সোরগোলে ফেটে যাবার জোগাড় হ'লো। কিন্তু কোনো মীমাংসার নামগন্ধও দেখা গেলো না।

শেষকালে এমন হ'লো যে, টেক্সাসের লোকেরা ফ্লোরিডার বাসিন্দাদের রাস্তায় দেখলেই মারামারি বাধিয়ে দেয়, আর ফ্লোরিডা তো সরকারিভাবে যুদ্ধ-ঘোষণার তোড়জোড় করতে লাগলো। এ-রকম অবস্থা দেখে বার্বিকেন ঘোষণা করলেন, 'টেক্সাসে আছে এগারোটি শহর, আর ফ্লোরিডায় মাত্র একটি। কাজেই ফ্লোরিডাকে মনোনীত না-করলে টেক্সাসের শহরে-শহরে লড়াই শুরু হবে. প্রত্যেকেই বলবে, "এ-শহরেই কামান তৈরি হোক"।'

৪

গান-ক্লাবের সমস্ত সিদ্ধান্তই যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লো, তখন কেবল সারা আমেরিকাতেই হুলস্থূল বাধলো না, সমস্ত পৃথিবীতে শোরগোল প'ড়ে গেলো। কেউ বলে আড়াইশো মণ ওজনের গোলা বার্বিকেন বানাতেই পারবেন না, আর ন-শো ফুট লম্বা কামান বানানো তো পাগলের খেয়াল। তাছাড়া এ-সব বানাতেও তো আর কম টাকা লাগবে না, সে-টাকা জোগাড় হবে কোত্থেকে? কেউ-বা বললেন, অমন কামানে বারুদ ঢালা অসম্ভব; কোনোরকমে যদিও-বা ঢালা যায়, তবে আড়াইশো মণ ওজনের গোলার চাপে তা আপনা থেকেই জ্ব'লে উঠবে। কেউ-বা বললেন, বারুদে আগুন দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই কামান ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। অনেকে আবার সোজাসুজি বললেন, কামানের গোলা দশ মাইল পথও যাবে না, চাঁদে পৌঁছনো তো দূরের কথা। কেউ-বা আবার বার্বিকেনের সমস্ত সিদ্ধান্তকেই সম্ভব ব'লে জোর গলায় ঘোষণা করলেন। বার্বিকেনের পক্ষে-বিপক্ষে দুটো দল খাড়া হ'য়ে গেলো।

বার্বিকেন কিন্তু এইসব উত্তেজনা নজরেই আনলেন না। তাঁর ভাবহীন মুখে ভালো-মন্দ কিছুরই আভাস পাওয়া গেলো না। এইসব নানা ধরনের হৈ-হল্লার মধ্যে বার্বিকেন ফ্লোরিডায় গেলেন কামান বানাবার জায়গা ঠিক করতে। অনেক ঘোরাঘুরির পর স্টোনিহিল তাঁর পছন্দ হ'লো; ঘোষণা করা হ'লো যে, এই স্টোনিহিল-এর চুড়ো থেকেই চন্দ্রলোক লক্ষ্য ক'রে কামান ছোঁড়া হবে।

ইম্পে বার্বিকেন সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র যাঁর নিন্দা-প্রশংসাকে গ্রাহ্য করতেন, তিনিও বার্বিকেনের মতোই পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা,

দুঃসাহসী, এবং বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাঁর নাম ক্যাপ্টেন নিকল। বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে কখনো তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হ'তো না। মৃত্যুকে সামনে দেখে তিনি কখনো পিছু হটতেন না। সমস্ত যুক্তরাজ্যে যখন ইম্পে বার্বিকেনের জয়গান গাওয়া শুরু হ'লো, তখন ফিলাডেলফিয়ায় ব'সে ব'সে ক্যাপ্টেন নিকল হিংসায় জ্বলতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন নিকল আর ইম্পে বার্বিকেনের মধ্যে কোনো পরিচয় ছিলো না, জীবনে কখনো পরস্পরের মুখোমুখি হননি তাঁরা; অথচ বার্বিকেনকে বিফল হ'তে দেখলে নিকল আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠতেন। বার্বিকেন যতোই জোরালো কামান তৈরি করতেন, নিকল ততোই সুদৃঢ় বর্ম বানাতেন। বার্বিকেন চাইতেন কঠিনতম পদার্থকেও কামানের গোলায় শতচ্ছিদ্র ঝাঁঝরা ক'রে ফেলতে, আর নিকলের কাজ ছিলো বার্বিকেনের সংকল্পকে ব্যর্থ করা। দু-জনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিন্তু কামান এবং বর্মের খুব উন্নতি হয়েছিলো, এবং সে-জন্যেই এই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে কে বড়ো তা বলা সম্ভব নয়। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে, দু-জনেই দু-জনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

ক্যাপ্টেন নিকল যখন শুনলেন যে বার্বিকেনের নতুন কামানের নলচে হবে ন-শো ফুট লম্বা এবং গোলার ওজন হবে দুশো চল্লিশ মণ পঁচিশ সের, তখন হতাশায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি ভেবেও কূল পেলেন না এখন তাঁর কাজ কী। কেবলই ভাবতে লাগলেন এমন কোনো বর্ম কি বানানো যাবে, যাতে এ-গোলাও প্রতিহত হবে, যার কাছে কোনো জারিজুরিই খাটবে না এ-গোলার। কিন্তু কোনো ভরসা পেলেন না তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এমন কোনো বর্ম তৈরি করা অসম্ভব।

আর সেইজন্যেই ঈর্ষায় তিনি আরো খেপে উঠলেন। অঙ্কের পর অঙ্ক ক'যে, বিজ্ঞানসম্মত নানান আলোচনা ক'রে

তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, গান-ক্লাবের সভাপতির পরিকল্পনাটি পাগলের কল্পনাবিলাস ছাড়া আর-কিছুই না। বাতুল না-হ'লে কি আর কোনো লোক এমন গাঁজাখুরি কল্পনা করতে পারে? বার্বিকেনকে মানসিক চিকিৎসালয়ে পাঠানো হোক— এ-কথাই তিনি বারে বারে বললেন। তবুও যখন বার্বিকেন তাঁর সংকল্প থেকে পিছু হটলেন না, বরং কামান এবং গোলা বানাবার জন্য প্রচণ্ড উৎসাহে তোড়জোড় করতে লাগলেন, তখন ক্যাপ্টেন নিকল সরকারকে বললেন যে, বার্বিকেন বে-আইনি কাজ করতে চাচ্ছেন; এ-ভাবে কামানের জোর পরীক্ষা করা রীতিমতো অন্যায়; কামানের জোর যাচাই করবার সময় যদি কামান ফেটে যায় তাহ'লে অগুন্তি মানুষ প্রাণ হারাবে, যে-জায়গায় পরীক্ষা হবে, সে-জায়গাও একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যেতে পারে; কিংবা এমনও তো হ'তে পারে যে বার্বিকেন শান্তিভঙ্গ ক'রে যুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনা নিয়েই এই কামান তৈরি করছেন!

সরকার কিন্তু ক্যাপ্টেন নিকলের কথায় কোনো কান তো দিলো না-ই, বরং চুপ ক'রে থেকে বার্বিকেনের প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। রকম-সকম দেখে নিকল আরো রেগে উঠলেন। খবর-কাগজে বার্বিকেনের বিরুদ্ধে নানারকম প্রবন্ধ রচনা করলেন তিনি: কিন্তু তাতেও তাঁর পক্ষে জনসম্মতি একত্রিত হ'লো না। তখন তিনি কাগজে প্রকাশ্যে বার্বিকেনের সঙ্গে এই ব'লে বাজি ধরলেন:

(ক) গান-ক্লাবের নতুন পরিকল্পনাকে সফল ক'রে তুলতে যতো টাকা লাগবে, তা কখনোই জোগাড় করা যাবে না। বাজি: এক হাজার একশো পঁচিশ ডলার।

(খ) ন-শো ফুট লম্বা কামান ছাঁচে ঢালাই করা সম্ভব হবে না। বাজি: দু-হাজার দু-শো পঞ্চাশ ডলার।

(গ) যদিও বা কামান বানানো সম্ভব হয়, কামানে বারুদ ঢালা কিছুতেই সম্ভব হবে না, কেননা আড়াইশো মণ ওজনের গোলার

চাপে তা আপনা থেকেই জ্ব'লে উঠবে। বাজি : তিন হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার।

(ঘ) বারুদে আগুন দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই কামানটি চক্ষের পলকে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। যদি তা না-হয় তবে আমি মিঃ ইম্পে বার্বিকেনকে চার হাজার চারশো পঞ্চাশ ডলার দিতে বাধ্য থাকবো। এবং

(ঙ) কামান যদি একান্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ না-হ'য়ে যায়, তাহ'লে চাঁদ তো দূরের কথা, কামানের গোলা দশ মাইল পথও যাবে না। বাজি : আট হাজার ন-শো ডলার।

অর্থাৎ, কামানের গোলা যদি দশ মাইল পথও অতিক্রম করতে পারে, তাহ'লে আমি মিঃ ইম্পে বার্বিকেনকে কুড়ি হাজার পঞ্চাশ ডলার দিতে আইনত এবং ন্যায়ত বাধ্য থাকবো।

(স্বাক্ষর) ক্যাপ্টেন নিকল'

দিন-কয়েক পরে ক্যাপ্টেন নিকল গান ক্লাবের সীল-মোহর দেয়া একটি লেফাফা পেলেন। তার ভিতরে একটি মূল্যবান চিঠির কাগজের মধ্যে শুধু একটি লাইন লেখা :

আমি বাজি ধরলুম।—বার্বিকেন : সভাপতি, গান ক্লাব।

৫

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ থেকে চাঁদা আসতে লাগলো গান-ক্লাবের নামে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এমন হ'লো যে ডাকঘরের লোকেরা মনি-অর্ডার বিলি করতে-করতে প্রায় হয়রান হ'য়ে যাবার জোগাড়। কিছুদিনের মধ্যেই বার্বিকেন দেখলেন যে গান-ক্লাবের নামে প্রায় তিন কোটির মতো টাকা জমেছে। তখন মহা উৎসাহে শুরু হ'লো কামান এবং গোলা বানানোর কাজ।

ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন দু-হাজার মজুর নিয়ে স্টোনিহিলে কাজ শুরু ক'রে দিলেন। এতোদিন জনহীন প'ড়ে-থাকা স্টোনিহিল এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি জনবহুল আধুনিক শহরে পরিণত হ'য়ে গেলো। কয়েকদিন ধ'রে জাহাজ থেকে শুধু কেবল কলকব্জা আর যন্ত্রপাতিই আনানো হ'লো। শাবল, কুড়ুল, কোদাল, হাতুড়ি ইত্যাদি যে কতো এলো তা কে গুনতে পারে! কতো রকমের যন্ত্রপাতি, কতো ক্রেন, বয়লার, চুল্লি, বেললাইন—এমনকি লোহা দিয়ে বানানো ছোটো-ছোটো ঘর-বাড়ি অবধি টম্পা-বন্দরে নামানো হ'লো। টম্পা থেকে মাইল পনেরো দূরে স্টোনিহিল। বার্বিকেন দু-দিনের ভিতর এই পনেরো মাইল রাস্তায় রেললাইন বসিয়েছিলেন।

এক বার্বিকেন যেন হাজার হলেন। যেখানে সামান্যতম অসুবিধে, সেখানে বার্বিকেন; যেখানে মজুরদের ভিতর সামান্য অসন্তোষ, সেখানে বার্বিকেন; যেখানে কাজ বেশি এগোচ্ছে না, সেখানে বার্বিকেন। এক কথায়, যেখানেই যাওয়া যাক না কেন সেখানেই দেখা যেতে লাগলো বার্বিকেনের উঁচু মাথা। তাঁর কাছে কোনো বাধাই আর বাধা হ'য়ে রইলো না। কোথাও-বা তিনি নিজে মাটি কাটছেন, কোনোখানে তাঁকে নিজ হাতে কাঠ

কাটতে দেখা গেলো, আবার কোথাও-বা তিনি নিজে কল চালাচ্ছেন। এ-সব দেখে-শুনে মজুররাও নতুন উৎসাহে ও উত্তেজনায় কাজ করতে লাগলো।

পয়লা নভেম্বর টম্পা থেকে স্টোনিহিলে এসে বার্বিকেন দেখলেন, সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই সারি-সারি ঘর-বাড়ি গ'ড়ে উঠেছে। ঘরে-ঘরে কুলি-মজুর, স্থপতি, তাঁতি-কামার বাস করছে, কাঠের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে সেই নতুন-তৈরি-হওয়া শহরকে, কারখানা তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক আলোর। বার্বিকেন সেদিনই মজুরদের একটি সভা ডাকলেন। বললেন, 'বন্ধুগণ! তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যেই শুনেছো যে আমরা ন-শো ফুট লম্বা একটা কামান বানিয়ে ঠিক সোজাভাবে মাটির উপর বসাতে চাই। কুড়ি ফুট উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে কামানটা ঘেরা থাকবে। কাজেই ষাট ফুট চওড়া আর ন-শো ফুট লম্বা একটি খাদ আমাদের তৈরি করতে হবে। এতো বড়ো একটা কাজ যদি ঠিক সময়ে ভালো-ভাবে করা যায় তাহ'লে আমাদের সমস্ত অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সার্থক হবে। যদি দিনে দশ হাজার ঘন-ফুট মাটি কাটা যায় তাহ'লেই কাজটা ঠিক সময়ে শেষ হ'তে পারে। আমরা তোমাদেরই অধ্যবসায় আর কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর ক'রে আছি। ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন যে-পরিকল্পনা মতো কাজ করতে বলবেন তোমরা যদি স্থিরভাবে কোনো দ্বিরুক্তি না ক'রে সে-কাজ ক'রে যাও তাহ'লেই আমাদের এই বিরাট পরিকল্পনা সার্থক হবে, এবং চন্দ্রলোক অভিমুখে পৃথিবীর প্রথম অভিযানের ইতিহাসে তোমাদের নামও সোনার হরফে লেখা হ'য়ে থাকবে।'

প্রাণপণে কাজ করতে লাগলো মজুররা। ওক কাঠের একটা খুব শক্ত ও বড়ো চাকার উপর পাথরের দেয়ালটা বানানো হ'তে লাগলো। মাটি কাটার সঙ্গে-সঙ্গে তা নামতে লাগলো মাটির নিচে। এই সাংঘাতিক দুঃসাহসী ও বিপজ্জনক কাজে দু-চারজনকে মারাত্মকভাবে

আহত হ'তে হ'লো, কেউ-কেউ প্রাণ পর্যন্ত হারালো।-মেনে ম্যাটসন দ'মে গেলো না। দিন-রাত সমানে কাজ চলতে লা; কিন্তু তাপে আওয়াজ শোনা গেলো কল-কব্জার, সকল সময় ায় পুড়ে গেলো গেলো ইঞ্জিনের, সুপটু ও সবল হাজার-হাজার নি। স্টোনি হিলে থাকলো একটানা। ার হুকুমে আগে

তিন মাসের মধ্যেই পাঁচশো ফুট গভীর সছিলো। গেলো, দশই জুন তারিখে কূপটি ন-শো ফুট নিচে ন। জ এগোতে গান-ক্লাবের সভ্যদের আনন্দ ত্যাখে কে! ঐ ন-শে াপছিলো, খাদকে কেন্দ্র ক'রে ছ-শো গজ দূরে বারোশো বড়ে, আগের বানানো হয়েছিলো। গোল্ড স্প্রিং কোম্পানি নিলে কাম মাটি করার ভার। আটষট্টিখানা জাহাজ বোঝাই ক'রে তারা কে . সতেরো লক্ষ মণ লোহাই আন'লো। কোম্পানি নিজেদের বড়ো-বড়ো চুল্লিতে ঐ লোহা একবার গালিয়ে কয়লা আর বালুর মধ্যে ঢেলেছিলো। কিন্তু পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাবার জন্যে ঐ লোহাকে আবার গলাবার দরকার হ'যে পড়েছিলো। সেই গলন্ত লোহার স্রোতকে কড়া থেকে এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে বের করিয়ে নিয়ে বারোশো নালার ঐ ন-শো ফুট গভীর খাদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

যেদিন খাদ বানানো শেষ হ'লো বার্বিকেন তার পরদিন সিমেন্ট নিয়ে খাদের ঠিক মাঝখানে ন-ফুট ব্যাসের ন-শো ফুট লম্বা কামানের নলচে তৈরি করতে শুরু করলেন। এই নল আর পাথরের পাঁচিলের মধ্যে যে ফাঁকা জায়গা ছিলো, তারই ভিতর গলন্ত লোহা ঢেলে কামান তৈরি করবার বন্দোবস্ত করা হ'লো।

লোহা ঢালাই করবার দিন ভোরবেলায় যেন অগ্নিকাণ্ড লেগে গেলো। দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে বারোশো চুল্লি, আগুনের লকলকে জিহ্বা যেন লাফাচ্ছে আকাশ ছোঁবার জন্যে, চিমনির মুখ দিয়ে হু-হু ক'রে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশ ঢেকে ফেলছে। শোনা যেতে লাগলো

কাটতে দেখা গেস আওয়াজ। ঠিক হ'লো যে একটা কামান থেকে এ-সব দেখে-শুনে-সঙ্গে-সঙ্গে একসঙ্গে সবগুলো কড়া থেকে লোহার বন্যা লাগলো। ... ওর ভিতর।

পয়লা নভেম্বর। একটা ছোট্টো টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে কিছু প্রেসিডেন্ট ইম্পে বার্বিকেন। বারোটার শেষ ঘণ্টা ঘরে-ঘরে কুড়ি তোপ দাগা হ'লো। তোপের আওয়াজ মিলিয়ে দেয়াল দিয়ে বারোশো পিপের ঘুলঘুলি দিয়ে আগুনের সাপ ফণা কারখানা এলো। তরল আগুনের বন্যা ছুটলো খাদের দিকে মজুরদের নালার ভিতর জোয়ার এলো তরল আগুনের। ঝড়ের নিশ্চর মতো তোলপাড়-তোলা ঢেউ তার। সেই তরল লোহা হু-হু ক'রে খাদের মধ্যে নামতে লাগলো, ঝাঁক বেঁধে আলোর ফুলকি উড়লো আকাশে, যেন বহু যুগের ঘুম ভেঙে জেগেছে অগ্নিগিরি বিসুবিয়সের জ্বালামুখ। মাটি কাঁপলো সেই তরল লোহার প্রবল স্রোতধারায়, যেন শুরু হ'লো দারুণ ভূমিকম্প।

লোহা ঢালাই হবার সপ্তাহ-খানেক পরেও দেখা গেলো কামানের নল দিয়ে তখনো উঠছে আগুনের লেলিহ লোল জিহ্বা। আরো এক সপ্তাহ কাটলো, কিন্তু কামানের নল দিয়ে অগ্নিবাষ্প ওঠার বিরাম নেই: তখনো তার এক মাইলের ভিতর যাবার উপায় নেই, আগুনের আঁচে ঝলসে যায় শরীর। অথচ নতুন কামান দেখবার জন্যে সবাই উদগ্রীব হ'য়ে আছেন। সত্যি-সত্যি যদি কামানটি ঠিক-মতো তৈরি না-হ'য়ে থাকে, সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ: কুড়ি বছরের মধ্যে তো চাঁদ আর পৃথিবীর এতো কাছে আসবে না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে গেলো সবার, আশা আর নিরাশার তুমুল বোঝাপড়ায়। সকলেই কামানটা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। বার্বিকেনও বোধহয় ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কখন কী-রকম থাকে, তা বোঝা হয়তো ঈশ্বরেরও অসাধ্য। এক মাইল জায়গা যে এমনভাবে তেতে থাকবে মাটি, তা

কেউ আগে বুঝে উঠতে পারেনি। কারো বারণ না-মেনে ম্যাটসন একবার কামানের কাছে যাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাপে তাঁর রবারের জুতো গ'লে গেলো, আগুনের আঁচে প্রায় পুড়ে গেলো পা, মরতে-মরতে কোনোরকমে পালিয়ে বাঁচলেন তিনি। স্টোনি হিলে তখন কারো ঢোকবার হুকুম ছিলো না। বার্বিকেনের হুকুমে আগে থেকেই স্টোনিহিলের ফটকে ফটকে কড়া পাহারা বসেছিলো।

আরো কিছুদিন গেলে বার্বিকেন মাত্র কয়েক গজ এগোতে পারলেন কামানের দিকে। তখনো সেখানকার মাটি কাঁপছিলো, তখনো চারিদিকের উষ্ণ মাটি থেকে তপ্ত বাষ্প উঠছিলো আগের মতো। শেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অগস্ট মাসের শেষদিকে মাটি ঠাণ্ডা হ'লো। একটুও সময় নষ্ট না-ক'রে বার্বিকেন কাজ শুরু ক'রে দিলেন। সিমেণ্টের ছাঁচটিও লোহার মতোই শক্ত হ'য়ে উঠেছিলো। কোনোরকমে কপিকলের সাহায্যে তা সরানো হ'লো। তারপর আস্তে-আস্তে কামানের অভ্যন্তরভাগ মসৃণ ক'রে তোলার কাজ আরম্ভ হ'লো।

অবশেষে বাইশে সেপ্টেম্বর দেখা গেলো কামানটা ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। তখনি সে-খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। ক্যাপ্টেন নিকলও অন্য সকলের সঙ্গে এ-খবর শুনলেন। বলাই বাহুল্য, দু-নম্বর বাজি হেরে গিয়ে তাঁর রাগ আরো বেড়ে গেলো।

৬

পরদিন—তেইশে সেপ্টেম্বর—স্টোনিহিলের ফটক থেকে কড়া অপসারিত হ'লো। স্টোনিহিলের বন্ধ ফটক সকলের জন্য উন্মুক্ত হ'লো। অমনি এক প্রবল জনস্রোত প্রবেশ করলো সেখানে। বিস্মিত ও বিস্ফারিত হাজার-হাজার চোখ মাটির নিচে বানানো ঐ কামানের দিকে তাকিয়ে রইলো : 'তাহ'লে সত্যিই চন্দ্রলোকে গোলা প্রেরণের কামানটা তৈরি হয়েছে!'

ছোট্টো শহর টম্পা। তারই কাছে কি এতো বড়ো একটা কাণ্ড হচ্ছে! শহরে মানুষের আর জায়গা হচ্ছে না দেখে শহরের কর্তৃপক্ষ পাশের গ্রাম এবং বিপুল প্রান্তর নিয়ে শহরের আয়তন বাড়িয়ে দিলেন। টম্পা আর ছোট্টো শহর হ'য়ে রইলো না, প্রায় নিউ ইয়র্কের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযোগী একটা শহর হ'যে উঠলো। দু-দিনের মধ্যেই চললো ট্রাম, গাড়ি-ঘোড়া; হাজার-হাজার দোকান বসলো, অগুন্তি ইশকুল, কলেজ, হাসপাতাল, সরাইখানা স্থাপিত হ'লো অল্পদিনের মধ্যে। আলাদিনের জাদু-প্রদীপের মায়ায় যেন রাতারাতি একটি আধুনিক বড়ো শহর হ'য়ে উঠলো টম্পা।

দু-দিন আগেও যে শহর তুচ্ছ ও নগণ্য ছিলো, এখন সেখানে যেন সারা যুক্তরাজ্য এসে বাসা বানালে। আমেরিকানরা কখনো অলস হ'য়ে ব'সে থাকবার লোক নয়, জাত-সদাগর তারা; চাঁদে কামানের গোলা পাঠানো দেখতে এসে তারা টম্পায় ব্যবসা ফেঁদে বসলো। কতো বড়ো বড়ো গুদাম বানানো হ'লো মাল বোঝাই ক'রে রাখবার জন্যে, কতো বাণিজ্যবিষয়ক খবরের কাগজ বেরোলো নতুন-তৈরি-হওয়া ছাপাখানা থেকে : সংক্ষেপে, দু দিন আগের ছোট্টো শহর টম্পা রাতারাতি এতো অদ্ভুত রকমে বদলে গেলো যে, যারা

আগে টম্পাকে দেখেছে, তারা এই নতুন শহর দেখে দু-হাতে চোখ কচলে ভাবতে লাগলো : রিপ ভ্যান উইঙ্কল হ'য়ে গেলুম না তো, না কি এসে পৌঁছলুম সেই সহস্রাধিক-এক আরব্য রজনীর কোনো রাতে ?

যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে টম্পার যোগাযোগের সুব্যবস্থার জন্যে নতুন একটি রেলপথ তৈরি হ'যে গেলো। যুক্তরাজ্যের সমস্ত লোক যেন ঝাঁক বেঁধে এসে ভেঙে পড়লো স্টোনিহিলে বানানো সেই কামান দেখতে। বাইরে থেকে কামানটার চেহারা দেখেই কেউ ক্ষান্তি দিলো না, মাটির নিচে ন শো ফুট নেমে কামানের তলা পর্যন্ত দেখতে লাগলো। নামবার সুবিধের জন্য বড়ো বড়ো কপিকল এনে বার্বিকেন তার সঙ্গে গদিমোড়া আসন যোগ করলেন : হাজার হাজার মানুষ টিকিট কেটে সেই আসনে ব'সে পাতালে ঢুকে কামান দেখতে লাগলো। পরে হিশেব ক'রে দেখা গিয়েছিলো, টিকিট বাবদই গান-ক্লাব দু কোটি টাকা উপার্জন করেছে।

একদিন গান ক্লাবের সকল সদস্য ন-শো ফুট নিচে কামানের তলায় ব'সে এক বিপুল ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। বৈদ্যুতিক আলোয় অন্ধকার পাতাল স্পষ্ট দিবালোকের মতো হ'য়ে উঠেছিলো। ভোজসভার পর সদস্যরা সবাই গান-ক্লাব এবং যুক্তরাজ্যের দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে ধ্বনি তুলেছিলেন। আর তাঁদের সেই সমবেত গলার ধ্বনি পাতাল থেকে ন শো ফুট উপরে উঠে হাজার কামানের গর্জনের মতো ছড়িয়ে পড়লো। মাটির উপরে তার জবাবে হাজার-হাজার কণ্ঠ থেকে সাড়া উঠলো : 'গান ক্লাব দীর্ঘজীবী হোক! যুক্তরাজ্য দীর্ঘজীবী হোক!

ম্যাটসন আহ্লাদে আটখানা হ'যে ব'লে উঠলেন, 'সারা দুনিয়ার বাদশাহী পেলেও আমি কিছুতেই এখান থেকে একচুলও নড়বো না। এক্ষুনি যদি কেউ এই বিশাল কামানে কার্তুজ ভ'রে গোলা পুরে দেয়, তাহ'লেও আমি এখানেই থাকবো। বরং গুঁড়ো-গুঁড়ো

হ'য়ে যাবো, তবু একচুলও নড়বো না।' একটু থেমে তিনি গান-ক্লাবের নামে 'হুরে' দিয়ে উঠলেন, যার জবাব অন্তরাও দিলে সমবেত গলায়।

পাতালে ভোজসভা ছেড়ে যখন বার্বিকেন বেরোলেন, তখন তাঁর খুশি-ভরা চোখ চকচক করছিলো। উপরে উঠে দেখলেন, তাঁর নামে একটি টেলিগ্রাম এসেছে। ভাবলেন যে কেউ হয়তো তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তার করেছে।

লেফাফা খুলে টেলিগ্রামখানা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ফর্শা মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেও একটু ঘাম জমলো তাঁর মুখে। রুমালে মুখ মুছে আবার টেলিগ্রামখানা পড়লেন বার্বিকেন, তারপর আবার পড়লেন, তারপর আবার। কিন্তু টেলিগ্রামটির কোনো সারমর্মই তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। এ কী লেখা এতে? এও কি সম্ভব? আবার টেলিগ্রামটি পড়লেন তিনি। তবু কোনো কিছুই তাঁর বোধগম্য হ'লো না। কম্পিত হাতে তিনি টেলিগ্রামটি সেক্রেটারি ম্যাটসনের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি তো এর মানে কিছুই বুঝতে পারছিনে ম্যাটসন। আপনি প'ড়ে দেখুন তো।'

ম্যাটসন বিস্মিতভাবে টেলিগ্রামটি বার্বিকেনের হাত থেকে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন :

'পারী : ফ্রান্স।

তিরিশে সেপ্টেম্বর : ভোর।

ইম্পে বার্বিকেন : টম্পা · ফ্লোরিডা : যুক্তরাজ্য : আমেরিকা।

আপনি যে-গোলাটা চাঁদে পাঠাবার জন্যে বানাচ্ছেন, দয়া ক'রে সেটা গোল না-ক'রে ফাঁপা ক'রে ডিমের আকারে তৈরি করুন। আমি ঐ গোলার ভিতরে ক'রে চাঁদে যাবো। আমি আসছি। আজ 'এস.এস.অ্যাটালাইন্টা' জাহাজে লিভারপুল ছাড়ছি।—মাইকেল আর্দা।'

চক্ষের পলকে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঘরে-ঘরে, রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-পশারে আপিশে-রেস্তোরাঁয়, জাহাজ-ঘাটায়, রেল-স্টেশনে—সর্বত্রই এক কথা : 'চাঁদে নাকি মানুষ যাচ্ছে !' যারা পৃথিবীর হালচালের কোনো খবরই রাখে না, তারা তৎপর গলায় বললে যে মাইকেল আর্দা নামে কেউ নেই, ওটা কারো বিশুদ্ধ ইয়ার্কির নমুনা। কেউ আবার বললো, ওটা ফরাশিদের বাতুলতার একটা নজির। পৃথিবীর মানুষ কী ক'রে চাঁদে যাবে ? বাতাসই বা পাবে কোথায়, আর নিশ্বাসই বা নেবে কী ক'রে ? ঐ বারুদের আগুনে তেতে ওঠা গোলার মধ্যেই তো পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। আর যদিই-বা কোনো দৈব মাহাত্ম্যে চাঁদে পোঁছোয়, ফিরে আসবে কী ক'রে ? এ অসম্ভব। আর এ-রকম আজগুবি কল্পনা-বিলাসে ওস্তাদ হচ্ছে ফরাশিরা। ওটা ওদের জাতের বৈশিষ্ট্য।

তক্ষুনি বার্বিকেন লিভারপুলের জাহাজ-আপিশে তার করলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই জবাব এলো : 'অ্যাটালান্টা জাহাজ লিভারপুল বন্দর ছেড়েছে। টম্পার উদ্দেশেই রওনা হয়েছে সে। সেই জাহাজের যাত্রী-তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত ফরাশি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আর্দার নাম আছে। আর বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, তিনি এস. এস. অ্যাটালান্টা ক'রে টম্পা যাচ্ছেন।'

খবর পেয়ে বার্বিকেনের চোখদুটি অদ্ভুত রকমে জ্ব'লে উঠলো, মুঠো হ'য়ে এলো অস্থির হাতদুটি। বার্বিকেন কোনো মতামত প্রকাশ না-করে যে-কোম্পানি গোলাটা বানাবার ভার নিয়েছিলো তাকে জানালেন : 'পরবর্তী খবর না-পাওয়ার আগে যেন গোলা বানাবার কাজে হাত দেয়া না-হয়।'

এদিকে আমেরিকার সর্বত্র মাইকেল আর্দার নাম লোকমুখে শোনা যেতে লাগলো। কেউ-কেউ বললে : 'শেষ পর্যন্ত অতো বড়ো একজন বৈজ্ঞানিক কিনা পাগল হ'য়ে গেলেন। আহা ! অবশ্যি প্রতিভাবানেরা একটু পাগলই হয়, কিন্তু তাই ব'লে এতোটা।'

বার্বিকেন যে গোলা-বানানোর কাজ আপাতত স্থগিত রাখতে হুকুম দিয়েছেন, তা শুনে কেউ-কেউ মন্তব্য করলে, 'শেষটায় ধীর-গম্ভীর বার্বিকেনও পাগল হ'য়ে গেলেন? চাঁদে মানুষ যাবে! কী অসম্ভব কথা! অমন আজগুবি পরিকল্পনায় মেতে থাকলে আমেরিকার গোলা আর কোনোদিনই চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবে না!'

দেখতে-দেখতে টম্পার লোকসংখ্যা চতুর্গুণ হ'য়ে গেলো। অগুন্তি লোক জমায়েত হ'য়ে যাওয়ায় টম্পায় দস্তুরমতো খাদ্য-সমস্যা দেখা দিলো। মাইকেল আর্দা, মাইকেল আর্দা, আর মাইকেল আর্দা! মাইকেল আর্দাকে একবার চর্মচক্ষে দেখবার জন্যে কেউ জাহাজে, কেউ রেলে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে টম্পার দিকে ছুটলো। লোকের ভিড় এতোটা বেড়ে গেলো যে একটি সূঁচ ফেলবার জায়গা পর্যন্ত রইলো না টম্পায়।

রাস্তায় ঘাটে, হাটে দোকানে সবখানেই শুধু এক কথা: 'মাইকেল আর্দা কবে আসছেন?' জাহাজ-আপিশের লোকজনেরা 'এস. এস. অ্যাটালান্টা' কবে আসবে বলতে-বলতে একেবারে পাগল হ'য়ে গেলো। একটি চালাক খবরের কাগজ 'এস.এস.অ্যাটালান্টা' কবে আসবে সেই তারিখ প্রকাশ ক'রে অন্য কাগজগুলোকে টেক্কা দিয়ে অনেক লাভ ক'রে ফেললো। শেষকালে টম্পার জনসমাবেশ এমন প্রচণ্ড হ'য়ে উঠলো যে, কর্তৃপক্ষ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলেন।

বিশে অক্টোবর সকালবেলায় দূরে দিগন্তে 'অ্যাটালান্টা'র চিমনির ধোঁয়া দেখা গেলো। হাজার-হাজার লোক দূরবীনের কাচে চোখ বসিয়ে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলো। সমুদ্রতীরে নিবিড় অরণ্যের মতো জনসমাবেশ হয়েছিলো ব'লেও শোরগোল খুব-একটা কম হ'লো না।

প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন এক-একটা বছর; সময় যেন কিছুতেই আর কাটতে চাচ্ছে না। কখন জাহাজ আসে, কখন মাইকেল

আর্দাঁকে দেখা যাবে—এই উৎকণ্ঠায় সকলে উদগ্রীব হ'য়ে রইলো। একসময়ে অবশ্য ভয়ংকর চ্যাঁচামেচির মধ্যে এই প্রতীক্ষার অবসান হ'লো। 'এস.এস.অ্যাটালাণ্টা' জেটিতে ভিড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ছোটো-বড়ো বহু নৌকো জাহাজটাকে ঘিরে ধরলো। এই ভিড়ের মধ্য থেকে অনেক চেষ্টা ক'রে গান-ক্লাবের সভাপতি বার্বিকেন সকলের আগে জাহাজে উঠে যাত্রীদেব দিকে তাকিয়ে জিগেস করলেন: 'মাইকেল আর্দাঁ ?'

একজন যাত্রী এগিয়ে এলেন। 'এই যে আমি। হাজির।'

৮

গান-ক্লাব-এর সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন তাঁর এতোদিনকার অবিচলতার সুনাম হারালেন। রুদ্ধ নিশ্বাসে হতবাক বার্বিকেন সবিস্ময়ে মাইকেল আর্দার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

মাইকেল আর্দা? ইনিই বিশ্ববিখ্যাত দুঃসাহসী ফরাশি বিজ্ঞানী? আর্দার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, দীর্ঘ সুঠাম শরীর, প্রশস্ত কপাল, শরীরের তুলনায় মাথার আকার একটু বড়ো, ধূসর কেশগুচ্ছ উড়ছে সমুদ্রের হাওয়ায়। শিকারী বেড়ালের মতো মস্ত গোঁফ, তীক্ষ্ণ নাক, চোখের মণি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে। সবল দুই বাহু, পৌরুষমণ্ডিত পদক্ষেপ। পোশাক সযত্নবিন্যস্ত। মানুষটিকে দেখেই মনে হ'ল যেন এক জীবন্ত প্রতিভার সম্মুখীন হলাম। ইনিই মাইকেল আর্দা? সাংবাদিকদের ক্যামেরায় এক সঙ্গে 'ক্লিক' ক'রে আওয়াজ হ'লো। মাইকেল আর্দাই আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পাতার শিরোনাম।

ফরাশি দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল আর্দার নাম য়ুরোপ এবং আমেরিকার কে না জানে? সারা পাশ্চাত্য দেশ জানতো, এই শিশু-সরল প্রতিভার হৃদয়ে নানা ধরনের দুঃসাহস অগ্নিশিখার মতো সর্বক্ষণ জ্বলে। অনাড়ম্বর এই বিজ্ঞান-সাধকের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের কতোদূর অগ্রগতি হয়েছে, তা কি আর কারো জানতে বাকি আছে এতোদিনে? নেপোলিয়নের মতো তিনিও বলতেন, 'অসম্ভব' এই শব্দটা কেবলমাত্র মূর্খদের অভিধানেই আছে। তিনি বলতেন, লোকে যাকে অসম্ভব ব'লে ভাবে, একাগ্র হ'য়ে একটু বুদ্ধি খরচ করলেই তা পৃথিবীতে সম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। হানিবলের মতো তিনিও বলতেন, আল্প্স্ পর্যন্ত আমাকে মাথা নুইয়ে পথ ক'রে দেবে।

সংক্ষেপে এই-ই হ'লো মাইকেল আর্দাঁর পরিচয়।

বার্বিকেন এতোক্ষণ ধ'রে অন্য সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে এই অদ্ভুত বিজ্ঞানীকেই দেখছিলেন। যখন আচম্‌কা হাজার গলা মাইকেল আর্দাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করলে, তখন তাঁর চমক ভাঙলো। ইম্পে বার্বিকেন দেখলেন, জাহাজের ঐ ছোট্টো ডেকটায় লোক আর ধরে না। মানুষের ভারে 'এস. এস্. অ্যাটালান্টা'র অবস্থা প্রায় কাহিল হ'য়ে এসেছিলো; জলেই বোধহয় ডুবে যায়—এমনি নিদারুণ অবস্থা। বার্বিকেন দেখলেন মাইকেল আর্দাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্যে ঠেলাঠেলি প'ড়ে গিয়েছে। করমর্দন কবতে-করতে ভদ্রলোক প্রায় শ্রান্ত হ'যে পড়েছেন, তবু উৎসাহী মানুষের শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক রকম-সকম দেখে তাঁর কেবিনে গিযে ঢুকলেন এই প্রচণ্ড প্রশংসার হাত এড়াবার জন্যে। চুম্বকের পিছনে লোহা যেভাবে ছুটে যায়, বার্বিকেন সে-রকমভাবে নীরবে পিছন-পিছন গিয়ে তাঁর কেবিনে ঢুকলেন।

কেবিনে ঢুকে কিছুক্ষণ দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন সম্বিত ফিরলে পর বার্বিকেন জিজ্ঞেস করলেন, 'মঁসিয়ে আর্দাঁ. আপনি কি তাহ'লে সত্যিই চাঁদে যাবেন ব'লে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

গম্ভীর গলায় উত্তর এলো, "নশ্চয়!'

'কোনোমতেই আপনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করবেন না?'

'না।' ধীব গলায় মাইকেল আর্দাঁ বললেন, 'না, কিছুতেই না কোনোরকমেই আমি এই সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবো না।'

'আপনার এই সংকল্প যে কতোদূর মারাত্মক হ'তে পারে, তা কি আপনি ভেবে দেখেছেন?'

'এর মধ্যে ভাববার আবার কী আছে?' মাইকেল আর্দাঁ গম্ভীর গলায় বললেন, 'কী আবার ভাববো? এ-রকম একটি সহজ এবং সাধারণ বিষয়ে খামকা ভেবে নষ্ট করার মতো সময়

আমার নেই। যখনি শুনতে পেলাম আপনারা চন্দ্রলোক অভিমুখে একটি কামানের গোলা পাঠাচ্ছেন, তখন মনে হ'লো এই সুযোগে একবার চাঁদ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। এটা আর এমন কী সাংঘাতিক ব্যাপার যে এ নিয়ে দিন-রাত মাথা ঘামাতে হবে? যাবো ব'লে একবার যখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, তখন যেমন ক'রেই হোক আমি যাবোই—এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।'

'হুঁ। তাহ'লে নিশ্চয়ই থাকবার একটা উপায়ও আপনি মনে-মনে ঠিক করেছেন। সেটা কী, জানতে পারি কি?'

'হ্যাঁ, উপায় একটা ঠিক করেছি বৈকি। সে-সব না-ভেবে আমি তো আর খামকাই পাগলের মতো এ-রকম একটা সিদ্ধান্ত নিই নি! তবে, এক-এক ক'রে প্রত্যেককে সে কথা ব'লে বেড়াবার মতো অবসর আমার নেই, তা' ছাড়া সেটা খুব একটা লোভনীয় ব্যাপারও নয়। আপনি বরং কালকেই একটা জনসভা ডাকুন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, তাহ'লে সে সভায় সমস্ত যুক্তরাজ্য কি সমস্ত পৃথিবীকেই আমন্ত্রণ জানাতে পারেন,—আমার তাতে কোনো রকম আপত্তি নেই। আমার যা কিছু বলবার সেই সভাতেই বলবো। কী মিস্টার বার্বিকেন, বলুন, আপনি এ প্রস্তাবে রাজি আছেন?'

কলের পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে বার্বিকেন তাঁর সম্মতি জানালেন মাইকেল আর্দাকে।

সেই রাত্রে প্রায় বারোটা পর্যন্ত মাইকেল আর্দার সঙ্গে ইম্পে বার্বিকেনের নানা বিষয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছিলো, কিন্তু কী কথা হয়েছিল, তা অবশ্যি কেউ ঠিক ক'রে বলতে পারে না। তবে রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বার্বিকেন যখন 'এস. এস. অ্যাটালাণ্টা' থেকে নেমে এলেন, তখন তাঁর মুখে এ ক-দিনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না, বরং তাঁর

মুখচোখ দেখে মনে হ'লো, তিনি রীতিমতো ফুর্তিতে আছেন এই মুহূর্তে।

সেই রাত্রেই সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দেয়া হ'লো, পরদিন সকালে বেলায় এক সমাবেশে বিখ্যাত ফরাশি বৈজ্ঞানিক আর্দাঁ তাঁর চন্দ্রভ্রমণ বিষয়ে এক বিবৃতি দেবেন।

৯

টম্পার নতুন-তৈরি-হওয়া টাউন হলে জনসংকুলান হবে না বুঝতে পেরেই বার্বিকেন একটি বড় মাঠের মধ্যে সভার আয়োজন করেছিলেন। একুশে অক্টোবর ভোরবেলায় সভা শুরু হবার আগেই অতো বড়ো মাঠটায় আর তিলধারণের জায়গাও রইল না। যখন সভা শুরু হ'লো, বার্বিকেন চারিদিকে তাকিয়ে আন্দাজ করলেন. অন্তত তিন-চার লাখ লোক জমায়েত হয়েছে—যে-আন্দাজ মোটেই ভুল হয় নি।

মাইকেল আর্দা আর ইম্পে বার্বিকেন একটি উঁচু মঞ্চের উপর বসে ছিলেন। সভা শুরু হলে সেই নিস্তরঙ্গ জনসমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাইকেল আর্দা ঠাণ্ডা, গম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, 'সমবেত ভদ্রবৃন্দ ! আমি কেমন ক'রে চাঁদে যেতে চাই, তার একটা উপায় বাৎলে দেবার জন্যেই আজকের এই সভার আয়োজন করা হয়েছে, যদিও এরকম কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেই সূত্রে প্রথমেই এ-কথা জানিয়ে রাখা ভালো, কোনো নিন্দা-প্রশংসা আমাকে স্পর্শ করবে না। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে অচিরেই কোনো দিন চাঁদে যাবার অনেক সুব্যবস্থা হবেই। জগৎ নিত্য-পরিবর্তনশীল—এ-তথ্য আপনারা দর্শনচর্চা ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই জেনেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা যে-কথা বলেন, তা হ'লো, রূপান্তরের এই জগতে একমাত্র রীতি হচ্ছে প্রগতি। মানুষের ক্ষমতা অসীম। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বস্তুজগতের অনেক কিছুই সে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে: এখনো যে-সব ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা সে দিতে পারেনি, উন্নতির অনিবার্য ধারায় আস্থাবান ব'লে আমি বিশ্বাস করি অচিরেই

সে সে-সবের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবে। পৃথিবীর প্রতিটি বিচিত্র সৃষ্টি মানুষের এই সীমাহীন বুদ্ধিবৃত্তিরই পরিচয় দেয়। একটা নজির নিলে এ-কথাটা পরিষ্কার হবে। প্রথমে মানুষ অন্য ইতর প্রাণীকে ব্যবহার করেছিলো যাতায়াতের বেলায়, পরে যন্ত্রকে। প্রথমে গোরুর গাড়ি, তারপর ঘোড়ার, তারপর মোটর, রেল। প্রথমে দাঁড়ে-টানা নৌকো, পরে কলে-চালানো জাহাজ। আমার তো মনে হয় ভবিষ্যতের মানুষেরা শুধু কামানের গোলায় চ'ড়েই যাতায়াত করবে। এতে সময় যেমন কম লাগবে, তেমনি পরিশ্রমও যথেষ্ট পরিমাণে কম হবে। আপনারা হয়তো বলবেন, গোলাটি ভয়ানক দ্রুত চলবে ব'লে ওর ভিতরে থাকতে পারা অসম্ভব। কিন্তু এই কথাটা যুক্তিসংগত কি না ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ জানাই। আমাদের এই পৃথিবী—যেখানে মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্য—তার গতি ন্যূনপক্ষে ঘণ্টায় তিরিশ হাজার মাইল। অবশ্য এমন প্রশ্ন না-ক'রে অনেকে আরেকটি মৌলিক জিজ্ঞাসার অবতারণা করবেন। তাঁরা বলবেন, মানুষ সীমাবদ্ধ জীব, পৃথিবীর গণ্ডীর বাইরে যাবার শক্তি তার নেই, পৃথিবী ছেড়ে গ্রহে-গ্রহান্তরে যাবার ক্ষমতা তার কোনোকালে আসবে না। কিন্তু এই ধারণা যে মস্ত একটা ভ্রান্তিমাত্র সেটা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? আজ আমরা প্রবল সমুদ্রে, মহাসমুদ্রে অনায়াসে পাড়ি জমাচ্ছি; আকাশ কি তার চেয়েও অজেয় কিছু? আমি তো সেই অদূর ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি: সুনীল শূন্য অধিকারে এসেছে মানুষের, পৃথিবীর অর্ধেক লোক হাওয়া বদলাতে চাঁদে চলেছে।'

মাইকেল আর্দাঁ নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থামতেই একজন শ্রোতা জিগেস করলেন, 'গ্রহগুলিতে কি কোনো প্রাণী আছে?'

'এখানে একজন শ্রোতা আমাকে জিগেস করছেন যে গ্রহগুলিতে কোনো জীবজন্তু আছে কি না।' মাইকেল আর্দাঁ

আবার তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন, 'উত্তরে আমি বলবো, নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবীও তো একটি গ্রহ, পৃথিবীতে যে কতো রকমের প্রাণী আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আর কুতার্ক, স্যুয়েডেনবার্গ, বার্নাডিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অনেক আলোচনা ক'রে এই মীমাংসায় পৌঁছেছেন যে সব গ্রহেই জীবজন্তু রয়েছে। তাঁদের সেই পরিভাষা-মণ্ডিত যুক্তিজালের পুনরাবৃত্তি না-ক'রে শুধুমাত্র এই কথাই বলবো যে, গ্রহে উপগ্রহে জীবজন্তু আছে কি না, তা আমার মতো মূর্খ ব্যক্তির বলা সাজে না। আছে কি না জানিনা ব'লেই তো দেখতে যাচ্ছি।'

এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকে দারুণ শোরগোল শুরু হ'লো। চ্যাচামেচি একটু কমলে পরে মাইকেল আর্দা বলতে লাগলেন, 'গ্রহে-উপগ্রহে যে প্রাণী আছে, ইচ্ছে করলে তার প্রচুর প্রমাণ দেখা যায়। সে-সব প্রমাণ দেবার জন্য আমি এখানে আসিনি। যদি কেউ বলতে চান সৌরজগৎ বাসের অযোগ্য, তবে তাঁকে আমি এ-কথাই জিগেস করতে চাই, আমাদের এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য, তার কী প্রমাণ তিনি দিতে পারেন? আপনারা জানেন আমাদের এই পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র একটি, যা আমার গন্তব্যস্থল। আর এমন গ্রহও আছে যাদের উপগ্রহ একাধিক। তবু সেগুলি বাসযোগ্য নয়, আর এই পৃথিবীই শুধু বাসযোগ্য,— এ-কথা কি বিশ্বাস করা যায়? পৃথিবীর ঋতুচক্রের আবর্তন কী-রকম জটিল একবার ভেবে দেখুন তো! কখনো দারুণ গরমে প্রাণ কণ্ঠাগত, কখনো-বা কনকনে ঠাণ্ডায় শরীরের রক্ত জ'মে যেতে চায়। পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপর একটু বাঁকাভাবে অবস্থিত থেকে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে ব'লেই তো দিন আর রাত্রির ব্যবধান, ঋতুতে ঋতুতে এতো বৈচিত্র্য, আর ঋতু-বদলের সময় আমাদের এতো অসুখ। কিন্তু জুপিটারকে দেখুন দেখি! জুপিটার তার মেরুদণ্ডের উপর ঈষৎ বাঁকাভাবে অবস্থিত, অতি সামান্যই

সেই বক্রতা, এবং সেই কারণেই সেখানে এ-রকম বিপরীত ধরনের ঋতুর সমাবেশ হয় না বর্ষচক্রে। অসুখবিসুখও তাই নিঃসন্দেহে সেখানে অনেক কম। জুপিটার যে এ-বিষয়ে পৃথিবীর চেয়ে ভালো, তা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে!'

এখানে প্রচণ্ড করতালির আওয়াজে মাইকেল আর্দার কণ্ঠস্বর চাপা প'ড়ে গেলো। একটু পরে সভার আবহাওয়া যখন কিঞ্চিৎ শান্ত হ'লো, তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনার মতে চাঁদে মানুষ আছে? তাহ'লে তাদের নিশ্চয়ই শ্বাস-প্রশ্বাসের বালাই নেই, কেননা চাঁদে তো বাতাস নেই ব'লেই জানি।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ ছুঁড়ে মারলেন মাইকেল আর্দা। 'তা সেটা জানালেন কী ক'রে? চাঁদে গিয়ে?'

'পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন চাঁদে বাতাস নেই, এবং তাঁদের কথা অবিশ্বাস করবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখি না।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখুন,' মাইকেল আর্দা বললেন, 'যাঁরা জেনে, শুনে, দেখে, সব কিছু পরখ ক'রে, যাচাই ক'রে পণ্ডিত, তাঁরা শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু যাঁরা কিছু না-জেনেই পণ্ডিত, তাঁরা আমার ঘৃণার পাত্র। আপনি কোন শ্রেণীর পণ্ডিতদের কথা শুনে ভাবছেন যে চাঁদে বাতাস নেই?'

'বাতাস যে নেই তার অগুন্তি অকাট্য প্রমাণ আমার হাতে আছে। আপনি বোধহয় জানেন যে যখন সূর্যকিরণ বাতাসের ভিতর দিয়ে আসে, তখন ঠিক সোজাভাবে আসতে পারে না, খানিকটা বাঁকাভাবে আসে। অর্থাৎ আলোকরশ্মির পরাবৃত্তি ঘটে! চাঁদ যখন নক্ষত্রকে ঢাকে, তখন নক্ষত্রের আলো চাঁদের পাশ ঘেঁসে আসে, কিন্তু আলোর একটুও পরাবৃত্তি হয় না। এতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে চাঁদে বাতাস নেই।'

ব্যঙ্গ করলেন আর্দাঁ, 'তাই নাকি ?'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় উত্তর করলেন, 'হ্যাঁ। সভেরোশো পনেরো সালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লুভিলে আর হেলি চন্দ্রগ্রহণের সময় ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছিলেন চাঁদে এক অদ্ভুত ধবনেব আলো দেখা যাচ্ছে। তাঁরা উল্কার আলোকেই চাঁদের আলো ব'লে ভুল করেছিলেন।'

'ও-কথা বাদ দিন। কেননা, সতেরোশো একাশি সালে হার্সেল তো চাঁদে আলো দেখেছিলেন।'

'দেখেছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলো যে সাত্য কী, তা তিনি নিজেই ঠিক করতে পারেন নি।'

'তাহ'লে তো আপনি দেখছি একজন "চন্দ্রতত্ত্ববিদ" !'

'মুর্সে বিযর বা মদলার মতো পণ্ডিতেরাও মেনে নিযেছেন যে চাঁদে বাতাস নেই।'

মাইকেল আর্দাঁ গম্ভীর হলেন এবারে 'ফবাশি জ্যোতির্বিদ মঁসিয় লসেদতের নাম শুনেছেন? শুনে থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর পর্যবেক্ষণের উপর আপনার শ্রদ্ধা জন্মাতো।'

'শ্রদ্ধা আমার আছে।'

'কিন্তু চাঁদে যে বাতাস নেই, এ-কথা তিনি বলেন নি, বরং তাঁর অভিমতই হ'লো চাঁদে বাতাস আছে।

'যদিও-বা বাতাস থাকে, তা নিশ্চযই খুব হাল্কা, মানুষের যোগ্য নয।'

'যতোই হাল্কা হোক একজনের উপযোগ। বাতাস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া একবার চাঁদে পৌঁছুতে পারলেই হ'লো, তারপব না-হয বৈজ্ঞানিক উপাযেই অক্সিজেন বানিয়ে নেয়া যাবে। চাঁদে যে-রকম বাতাসই থাক, বাতাস আছে বলে যখন স্বীকার করেছেন, তখন এও নিশ্চয়ই স্বীকার করেছেন যে জলও আছে। কেননা জল না থাকলে বাতাস থাকবে কী ক'বে ?'

'আচ্ছা, তা না-হয় হ'লো। কিন্তু গোলাটা যখন বায়ুস্তর ভেদ ক'রে উঠবে, তখন সেই ঘর্ষণে যে-উত্তাপ—'

বাধা দিয়ে মাইকেল আর্দাঁ বললেন, 'সেই উত্তাপে আমি পুড়ে মরবো ভাবছেন? তা যদি ভেবে থাকেন তো মস্ত ভুল করেছেন, কেননা, বায়ুস্তর পেরিয়ে যেতে ক-সেকেণ্ড লাগবে জানেন তো? তা ছাড়া গোলার পাশটাও খুব পুরু হবে।'

'খাদ্য এবং পানীয়ের কী-ব্যবস্থা করবেন?'

'তা বছর খানেকের উপযোগী সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। মাত্র তো চারদিনের পথ, তারপর চাঁদে গিয়ে যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'পথে নিশ্বাস নেবার বাতাস পাবেন কী-ক'রে?'

'বৈজ্ঞানিক উপায়ে বানিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবো।'

'চাঁদে যদি-বা গোলাটা গিয়ে পৌঁছয়—অবশ্য আদৌ পৌঁছুবে কি না সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে—কিন্তু যদি-বা গিয়ে পৌঁছয়, তখন প্রচণ্ড বেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বেন—'

'তখন পৃথিবীতে পড়লে যতোটা জোরে পড়তুম, সেখানে তার অন্তত ছ-গুণ কম হবে।'

'তাহ'লেও তো আপনি কাচের টুকরোর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাবেন!'

'হবো না, কেননা ইচ্ছে করলেই পতন-বেগ কমিয়ে নেয়া যাবে। আমি কতোগুলো হাউই সঙ্গে নেবো। উপযুক্ত সময়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেই গোলার বিপরীত দিকে একটি গতির সৃষ্টি হবে, কাজেই আমি নির্বিঘ্নেই চাঁদে অবতরণ করতে পারবো।'

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'তাহ'লে আপনি না-হয় নির্বিঘ্নেই চাঁদে পৌঁছুলেন, কিন্তু পৃথিবীতে ফিরবেন কী ক'রে?'

'ও! এই কথা!' হেসে উঠলেন মাইকেল আর্দাঁ। 'আমি

যে ফিরবো, এ-কথা আপনাকে কে বললে? আমি তো আর ফিরবোই না।'

এ-কথা যারা শুনলো তারা বিদ্যুতাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এই দুঃসাহসী বৈজ্ঞানিক বলছেন কী? যে-ভদ্রলোক এতোক্ষণ ধ'রে জেরা করছিলেন তিনি বললেন, 'আরেকটি মস্ত বিপদ আপনার সামনে দেখতে পাচ্ছি। যে-মুহূর্তে অতো বড়ো একটা গোলা কামানের নলচে থেকে বেরোবে, অমনি এমন একটা ধাক্কা লাগবে যে তাতেই গোলার মধ্যে আপনার হাড়গোড় ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে।'

একটু চিন্তিত স্বরে মাইকেল আর্দা বললেন, 'এতক্ষণে আপনি একটি সত্যিকার বাধার কথা তুলেছেন। তা সে নিয়ে আমার মাথা না-ঘামালেও চলবে। আমার বন্ধু এর একটা উপায় বের করবেনই।'

ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'এতো বড়ো মাথাওলা ব্যক্তিটি কে বলবেন কি?'

গম্ভীরস্বরে মাইকেল আর্দা বললেন, 'তিনি গান-ক্লাবের সুবিখ্যাত সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন '

'ওঃ! সেই উজবুকটা, যার প্রস্তাবে সমস্ত পৃথিবী বোকার মতো নেচে উঠেছে!' কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে ভদ্রলোক বার্বিকেনকে লক্ষ্য করেই এ-কথা বললেন। বার্বিকেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। লাফিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে ভদ্রলোকের দিকে এগোবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোক যে কোথায় মিশে গেলেন তা আর বোঝা গেলো না।

মাইকেল আর্দার দুঃসাহসী সংকল্প কিন্তু জনতার মধ্যে পাগলা হাওয়ার ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো। বার্বিকেনকে মঞ্চ থেকে নামবার অবসর আর কেউ দিলো না। তারা আর্দা আর বার্বিকেনকে

মঞ্চশুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়ে হৈ-চৈ করতে-করতে জাহাজ-ঘাটের দিকে এগোলো। মঞ্চটা কাঁধে বওয়াই এক মহা গৌরবের বিষয় হ'য়ে উঠলো ; ঐ কাঠের মঞ্চটা বইবার জন্যেই হুটোপাটি শুরু হ'য়ে গেলো সেখানে।

যে-ভদ্রলোক এতোক্ষণ ধ'রে আর্দাকে জেরা করছিলেন, তিনি কিন্তু এ-সুযোগে পালিয়ে যাননি। শোভাযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে তিনিও জাহাজ-ঘাটের দিকে এগুচ্ছিলেন। যখন মঞ্চটা টম্পা বন্দরে নামানো হ'লো, তখন বার্বিকেন ও আর্দা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। নেমে এসেই বার্বিকেন সেই ভদ্রলোককে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বহু কষ্টে রাগ চেপে তিনি ঠাণ্ডা গলায় ভদ্রলোককে বললেন, 'শুনুন তো একটু। এদিকে আসুন, কথা আছে।'

ভদ্রলোক নীরবে ভাবলেশহীন মুখে বার্বিকেনকে অনুসরণ করলেন। একটু আড়ালে গিয়ে বার্বিকেন তীব্র গলায় বললেন, 'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'লোকে আমাকে ক্যাপ্টেন নিকল ব'লে জানে'

১০

'ক্যাপ্টেন নিকল!'

'হ্যাঁ।'

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাত হ'লেও বার্বিকেন এতোটা চমকে উঠতেন কি না সন্দেহ। 'আজই আমাদের প্রথম দেখা হ'লো।'

'আমি নিজেই দেখা করতে এসেছি।'

'আপনি আমাকে আজ অপমান করেছেন!'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে ক'রেই করেছি—লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে করেছি।'

'আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই।' স্থির গলায় বার্বিকেন জানালেন।

'বেশ তো। এক্ষুনি এর মীমাংসা হ'য়ে যাক। আমি প্রস্তুত আছি।'

'না, এখন সময় নেই। আমাদের মুখোমুখি দেখা হওয়া উচিত গোপন কোনো জায়গায়। টম্পা থেকে মাইল তিনেক দূরে যে-বনটা আছে, চেনেন?'

'খুব চিনি।'

'কাল ভোর পাঁচটায় সেখানে হাজির হ'তে পারবেন কি?'

'নিশ্চয়ই পারি, অবশ্য যদি অনুগ্রহ করে আপনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে রাজি থাকেন।'

'আপনার বন্দুকটা সঙ্গে আনতে ভুলবেন না।'

বিদ্রূপের স্বরে ক্যাপ্টেন নিকল বললেন, 'আপনি না-ভুললেই হ'লো।'

বার্বিকেন তক্ষুনি সে-স্থান পরিত্যাগ করলেন।

সেদিন সারা রাত বার্বিকেনের বিনিদ্র কেটেছিলো বিছানায় ছটফট ক'রে। পরদিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনায় নয়; কামান থেকে গোলা বেরোবার সময় গোলার গায়ে যে-ধাক্কা লাগবে, কী ক'রে সেই ধাক্কা সামলে ওঠা যায়- তার চিন্তায়।

বাইশে অক্টোবর ভোর হবার আগেই ম্যাটসন হুড়মুড় ক'রে ছুটে এসে আর্দাঁর শোবার ঘরের দরজায় সজোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন। প্রথমটায় কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। শেষ-কালে ম্যাটসন প্রচণ্ডভাবে দরজায় ধাক্কা মারতে-মারতে বললেন, 'দরজা খুলুন মঁসিয় আর্দাঁ, দোহাই ধর্মের, দরজাটা খুলুন! সাংঘাতিক বিপদ, খুলুনই না দরজাটা!'

তখনো ঠিক ভোর হয়নি। ঝাপসা অন্ধকার দূর করবার জন্যে রাস্তায় তখনো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। আর্দাঁ তাড়াহুড়ো ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে দুয়ার খোলার সঙ্গে-সঙ্গে এক ধাক্কায় তাঁকে সরিয়ে ম্যাটসন ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কাল প্রকাশ্য সভায় যে-ভদ্রলোক বার্বিকেনকে অপমান করেছিলেন, বার্বিকেন তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছেন। সে-ভদ্রলোক হচ্ছেন বার্বিকেনের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন নিকল। আজ ভোরেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ, একটু পরেই। হয় নিকল, না-হয় বার্বিকেন—দু-জনের একজনকে আজ প্রাণ হারাতেই হবে। বার্বিকেন নিজে আমাকে এ-কথা বলেছেন। আরো বলেছেন যে, পৃথিবী অনেক ছোটো ব'লেই তাঁদের দু-জন একই কালে বেঁচে থাকতে পারেন না, কেবল একজনেরই স্থান-সংকুলান হয় এখানে: সুতরাং একজনকে আজ মরতেই হবে। কিন্তু যে-ক'রেই হোক এ-লড়াই এখন আমাদের বন্ধ রাখতে হবে। বার্বিকেনকে এখন আমরা কিছুতেই মরতে দিতে পারিনে।

যে-কোনো রকমেই হোক এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্থগিত রাখতেই হবে। অথচ আপনি এ-বিষয়ে সচেষ্ট না-হ'লে তার কোনো উপায় দেখছিনে মঁসিয় আর্দাঁ।'

মাইকেল আর্দা দ্রুত হাতে পোশাক পরতে-পরতে বললেন, 'আপনাদের দেশের লোক দেখছি খামকা-খামকা খুনোখুনি ক'রে মরে! মিস্টার বাবিকেন এখন কোথায়?'

'তা ঠিক জানিনে। বোধহয় এতোক্ষণে লড়াইয়ের জায়গায় পৌঁছে গেছেন।'

'লড়াইয়ের জায়গাটা কোথায়?'

'শহরের কাছেই একটা বন আছে; সেই বনে।'

দু-জনে আর একমুহূর্তও দেরি না-ক'রে বনের দিকে ছুটলেন। বড়ো রাস্তা দিয়ে গেলে দেরি হ'তে পারে ভেবে মাঠের মধ্য দিয়েই ছুটলেন, রীতিমত দৌড়ুলেন বলা চলে। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই ম্যাটসন বাবিকেনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকলের সাপে-নেউলে ঝগড়ার কথা সংক্ষেপে খুলে বলতে লাগলেন। বনের মুখে এক কাঠুরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'লো। কাঠুরেকে দেখেই আর্দা শুধোলেন, 'বনে কোনো শিকারীকে কি দেখেছো?'

'শিকারী? তা একজন বন্দুকধারীকে তো দেখেছি একটু আগে।'

'একটু আগে? কখন?' ব্যগ্র গলায় ম্যাটসন জিগেস করলেন, 'কখন দেখলে?'

'তা সে ঘণ্টাখানেক হবে।'

ম্যাটসন আর আর্দা একসঙ্গেই ব'লে উঠলেন, 'ঘণ্টাখানেক! তবে তো এতোক্ষণে সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে! তুমি কি কোনো বন্দুকের আওয়াজ শুনেছো?'

উত্তরে কাঠুরে এই কথাই জানালো যে, না, সে কোনো বন্দুকের আওয়াজ শোনেনি।'

'একবারও শোনো নি?'

'না।'

'শিকারীকে কোনদিন দেখেছো ?'

কাঠুরে আঙুল দিয়ে গভীর বনের একপ্রান্তে দেখালো। ম্যাটসনের হাত ধরে আর্দা তক্ষুনি সেদিকে ছুটলেন।

কী গভীর বন। কোনোকালে যে যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করেছে এমন কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। বিশেষ ক'রে বনের সে-অংশটা এতো ঘন যে কয়েক হাত দূরের মানুষকেও দেখবার সম্ভাবনা নেই। অনেকক্ষণ বনে-বনে ঘুরে শেষে আর্দা বললেন, মিস্টার ম্যাটসন আমার মনে হচ্ছে বারবিকেন হয়তো-বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সংকল্প ছেড়েছেন, বনে আসেন নি।'

গম্ভীর স্বরে একটু অহমিকার সঙ্গে ম্যাটসন বললেন, 'অসম্ভব। মার্কিনীরা কখনো কথার খেলাপ করে না, বিশেষ ক'রে এ-সব ক্ষেত্রে তো নয়ই!'

আর্দা আর কোনো কথা না-ব'লে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। বারবিকেন আর নিকলের নাম ধ'রে চেঁচিয়ে ডাকতে-ডাকতে তাঁরা আরো গভীর বনে ঢুকলেন। কিছুদূর এগিয়ে ম্যাটসন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। 'ওটা কী দেখুন তো—'

'নিঃসন্দেহে একজন মানুষ।'

'জ্যান্ত, না মরা? কই, নড়ে-চড়ে না তো? বন্দুকও তো হাতে দেখছি না। লতা পাতার আড়াল থেকে মুখটাও দেখা যাচ্ছে না ভালো ক'রে।'

আর্দা বললেন, 'চলুন, কাছে যাই।'

দুজনে আরেকটু এগোতেই ম্যাটসন লোকটিকে চিনতে পারলেন: ক্যাপ্টেন নিকল। ক্ষোভে-দুঃখে-রাগে তাঁর দু-চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগলো। দাঁতে দাঁত চেপে ম্যাটসন বললেন, 'উনি ক্যাপ্টেন নিকল।—তাহ'লে নিশ্চয়ই বারবিকেনের মৃত্যু হয়েছে।'

১১

'ক্যাপ্টেন নি-ক-ল!' আর্দা নামটা আরেকবার অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল!' দু-জনে নিকলের কাছে গিয়ে দেখলেন একটি পাখির ছানা বিষাক্ত মাকড়সার জালে আটকে ছটফট করছে, আর নিকল আলগোছে সযত্নে পাখিটাকে জাল থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। তাঁর বন্দুকটা পায়ের কাছে প'ড়ে আছে। পাখির ছানাটিকে জাল থেকে মুক্ত ক'রে নিকল উড়িয়ে দিলেন। ডানা ঝাঁপিয়ে উড়ে গিয়ে পাখিটা কাছেই একটা গাছের ডালে গিয়ে বসলো। নিকল কোমল চোখে পাখির ছানাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর্দা এই দৃশ্য দেখে অবাক হ'য়ে ভাবলেন, যাঁর মনের মধ্যে এ-রকম স্নেহের ধারা ব'য়ে চলেছে, তিনি কি কখনো নিষ্ঠুর খুনী হ'তে পারেন? কাছে গিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল, সত্যই আপনি বীর!'

নিকল সচমকে তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন, 'একি! মঁসিয় আর্দা যে! তা আপনি এখানে কেন?'

'আপনার সঙ্গে বন্ধুতা ক'রে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে এসেছি ক্যাপ্টেন নিকল! এ-যুদ্ধে লাভ কী, বলুন তো? খামকা একটি মূল্যবান জীবন বিনষ্ট হবে। হয় আপনি মরবেন, নয় তো বার্বিকেন—'

বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন নিকল ব'লে উঠলেন, 'কী বললেন? বার্বিকেন? আমি দু-ঘণ্টা ধ'রে তাঁর খোঁজ করছি। কোনো আমেরিকান যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিমন্ত্রণ ক'রে এভাবে পালিয়ে যায়, তা আমি জানতুম না।'

ম্যাটসন চ'টে উঠে তীব্র গলায় বললেন, 'আমেরিকানরা কখনো চম্পট দেয় না। ভোর হবার অনেক আগেই বার্বিকেন এদিকে এসেছেন।'

'তবে আর দেরি ক'রে লাভ কী?' ক্যাপ্টেন নিকল বললেন, 'আমার প্রচুর কাজ আছে। খামকা সময় নষ্ট করতে চাই না। চলুন, তাঁকে খুঁজে দেখা যাক। এতো সামান্য একটা কাজের জন্য এভাবে সময় নষ্ট করা শোভন দেখায় না।'

মাইকেল আর্দা বললেন, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। এতো ব্যস্ত হ'য়ে কী লাভ? বার্বিকেন যদি জীবিতই থাকেন, তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই এখানে তাঁর দেখা পাবো। কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি আপনাদের দু-জনের মধ্যে দেখা হ'লে আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে না।'

'উঁহু!' ক্যাপ্টেন নিকল ঘাড় নাড়লেন। 'সে হয় না। আজ আমাদের একজনকে মরতেই হবে। আমাদের দু'জনের একসঙ্গে পৃথিবীতে থাকবার অধিকার নেই।'

এ-কথা শুনে ম্যাটসন বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল! আমি বার্বিকেনের বন্ধু, তাঁর ডান হাত বললেও চলে। আজ যদি আপনার কোনো মানুষ না মারলেই না চলে, তবে আমাকেই গুলি করুন। আমাকে মারাও যা, বার্বিকেনকে মারাও তাই।' এই ব'লে তিনি ক্যাপ্টেন নিকলের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

নিকলের চোখে যেন চকিতের জন্য শয়তানের আবির্ভাব হ'লো। তিনি বন্দুক তুললেন। সর্বনাশ হ'তে চললো দেখে দু-জনের মাঝে প'ড়ে মাইকেল আর্দা বললেন, 'আ-হা-হা! করেন কী! আমি মানুষে-মানুষে খুনোখুনি অপছন্দ করি! ক্যাপ্টেন নিকল, আমি আপনার কাছে এমন একটা প্রস্তাব করবো যে আপনার মরতে বা মারতে ইচ্ছেই হবে না।'

অবিশ্বাসের সঙ্গে বন্দুক নামিয়ে ক্যাপ্টেন নিকল বললেন,

'আপনার সেই লোভনীয় প্রস্তাবটা শুনতে পারি?'

'একটু পরেই জানতে পারবেন। বার্বিকেনের সামনে ছাড়া সে-কথা বলা ঠিক হবে না।'

'বেশ। তবে চলুন, তাঁকে খুঁজে দেখি।'

'চলুন।'

তিনজনে তখন বার্বিকেনের খোঁজে চললেন। কিছুদূর গিয়েই নিকল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অদূরে তর্জনীনির্দেশ করলেন। দেখা গেলো, একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বার্বিকেন দাঁড়িয়ে আছেন।

বার্বিকেনের নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে সেদিকে এগোলেন আর্দাঁ। কিন্তু কোনো সাড়া নেই, বার্বিকেন যেন একটি পাথরের মূর্তি। আর্দাঁ কাছে গিয়ে দেখলেন, বার্বিকেন তন্ময় হ'য়ে কতোগুলো জ্যামিতিক নক্সা আঁকছেন, আর তাঁর পায়ের কাছে বন্দুকটা প'ড়ে। আর্দাঁ তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন, 'মিস্টার বার্বিকেন!'

চমকে উঠলেন বার্বিকেন। 'একী! মঁসিয় আর্দাঁ!—ইউরেকা! ইউরেকা! আমি পথ বের ক'রে ফেলেছি! আর কোনো ভাবনা নেই!'

'কিসের পথ?'

'সেটার।'

'কোনটার?'

'গোলাটা যখন কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরোবে, তখন যাতে কোনো ধাক্কা না লাগে তার পথ বের ক'রে ফেলেছি!'

খুশি হ'য়ে আর্দাঁ জিগ্যেস করলেন, 'সত্যি?'

একটু হেসে বার্বিকেন বললেন, 'ও আর বেশি কী! জলকে স্প্রিং-এর কাজে লাগালেই হয়। তার উপর থাকবে বসবার আসন।—আরে! ম্যাটসন যে? ব্যাপার কী?'

আর্দা বার্বিকেনের হাত ধ'রে বললেন, 'ঐ গাছটার কাছে ক্যাপ্টেন নিকলও দাঁড়িয়ে আছেন। চলুন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

বার্বিকেনের কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠলো। লাল হ'য়ে উঠলো গাল। লাজুক গলায় বললেন, 'কী লজ্জা! কথা র'খতে পারিনি।' ক্যাপ্টেন নিকলকে এগোতে দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল! মাপ করবেন! আমারই গাফিলতির জন্য আপনার প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। চাঁদে গোলা পাঠাবার কথা ভাবতে-ভাবতে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তা চলুন এখন, আমি প্রস্তুত।' বার্বিকেন তাঁর বন্দুকটা তুলে নিলেন।

মাইকেল আর্দা বাধা দিয়ে বললেন, 'উঁহু! সেটি হচ্ছে না। পৃথিবীর বরাত ভালো যে লড়াইটা আগেই শেষ হ'য়ে যায়নি। আপনারা দু-জনেই প্রতিভাবান, কোনো সাধারণ রগ-চটা মানুষ নন। প্রতিভাকে হত্যা করবার জন্যই কি আপনাদের জন্ম হয়েছে?'

বার্বিকেন ও নিকল নীরবে মাথা নিচু ক'রে লজ্জিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর্দা ব'লে চললেন, 'আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছি যে, আপনারা দু-জনেই মস্ত একটা মারাত্মক ভুলের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই ভুলটাকে যতই বড়ো করে দেখছেন, ততোই আপনারা ক্ষেপে উঠছেন। বার্বিকেনের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর গোলা চাঁদে পৌছুবেই, আর নিকল ভাবছেন তা' হতেই পারে না।'

নিকল বললেন, 'ঠিক ও-গোলা কি কখনো চাঁদে পৌছুতে পারে?'

বার্বিকেন বাধা দিয়ে বললেন, 'পারে না মানে? নির্ঘাৎ পারে।'

মাইকেল আর্দা বললেন, 'বেশ তো, তাহ'লে আপনারা দু-জনেই আমার সঙ্গে চাঁদে চলুন না কেন? গোলাটা চাঁদে পৌছোয় কি না,

তা স্বচক্ষে দেখেই সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন করতে পারবেন।'

বার্বিকেন আর নিকল তক্ষুনি একসঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'আমি রাজি আছি।'

ওঁদের দু-জনের আর দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমাপ্ত করা হ'য়ে উঠলো না।

তখনো অনেকেই পুরোপুরি বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছিলেন না, গোলার ভিতরে সত্যিই মানুষের যাওয়া সম্ভব কি না। সকল সন্দেহের অবসান করবার জন্য বার্বিকেন একটি বত্রিশ ইঞ্চি কামান আনলেন। একটি ফাঁপা গোলা তৈরি ক'রে তার ভিতরটা স্প্রিং-এর গদি দিয়ে মুড়ে দেয়া হ'লো। তারপর গোলার ভিতর একটা জ্যান্ত বেড়াল আর একটা শজারু রেখে ঢাকনিটা স্ক্রু দিয়ে বন্ধ করা হ'লো। কামানে দু-মণ বারুদ পুরে তারপর গোলাটাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না। গোলাটা হাজার ফুট উপরে উঠে একটু বেঁকে মাটিতে পড়লো। তাকে কুড়িয়ে এনে দেখা গেলো, বেড়ালটা কিঞ্চিৎ আহত হয়েছে সত্যি, কিন্তু গোলার ভিতরে ব'সেই সে শ্রীমান শজারুকে উদরসাৎ করেছে।

পরীক্ষার ফল দেখে সবাই খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন। ম্যাটসন তো বারবার বলতে লাগলেন, 'আমাকেও সঙ্গে নিন আপনারা, আমিও চাঁদে যাবো।' বার্বিকেন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা কী ক'রে হয় ম্যাটসন? অতো জায়গা আমরা পাবো কোত্থেকে?' ম্যাটসন রীতিমত মুষড়ে প'ড়ে তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্য নাছোড়বান্দার মতো বারবার আর্দাকে অনুরোধ করতে লাগলেন

এদিকে আর্দা আবার এক বিষম বিপদে পড়েছিলেন। প্রত্যহ এতো লোক চাঁদে যাবার বায়না নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগলো যে, তিনি দস্তুরমতো বিরক্ত হয়ে উঠলেন। একদিন তো কতগুলো লোক এসে বললো, 'আমরা চাঁদের মানুষ। দেশে ফিরে যাবার জন্য বড়ো মন-কেমন করছে, অনেক দিন দেশ ছাড়া

কিনা!' আর্দা একটু হেসে তাদের বললেন, 'দেখুন, এবার গোলায় জায়গা বড্ডো কম, সুতরাং সে-বিষয়ে আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারবো না। তবে চাঁদে পৌঁছে আপনাদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবো।'

যারা মাইকেল আর্দার দেখা পেলো না, তারা তাঁকে চিঠি লিখতে শুরু করলো। প্রত্যেকদিন এতো চিঠি আসতে লাগলো যে ডাক-ঘরের লোকেরা পর্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। আর্দা তো অতো চিঠি পড়বারই সময় পেলেন না, জবাব দেওয়া তো দূরের কথা। চাঁদে যাবার উপসর্গ হিশেবে এমন কোনো উপদ্রব যে জুটতে পারে, তা তিনি ভুলেও কল্পনা করেন নি।

তারপর অবশেষে এলো দশই নভেম্বর, বহু-প্রতীক্ষিত সেই শুভ দিন। যে কোম্পানি গোলাটা বানাবার ভার নিয়েছিলো, তারা তৈরি-হয়ে-যাওয়া গোলাটা বার্বিকেনকে পৌঁছে দিলো। যেই না গোলাটা বানানোর খবর কাগজে বেরোলো, অমনি হাজার-হাজার লোক পাগলের মতো গোলাটা দেখতে ছুটলো। সকলে যাতে দেখতে পারে সেজন্য বার্বিকেন গোলাটা একটা খোলা মাঠে রেখেছিলেন. তবু আর জায়গা হয় না! লোকের ভিড়ে আর চ্যাঁচামেচিতে সকলে উত্ত্যক্ত হ'য়ে উঠলেন: কাঁহাতক আর এ আপদ সহ্য করা যায়? আর্দা গোলাটা দেখে খুশি হ'লেও ঠাট্টা করলেন, 'এ কী বানিয়েছেন, বার্বিকেন? গোলাটা দেখতে তো মোটেই সুন্দর নয়! এমন একটা বিশ্রী গোলা দেখে চাঁদের অধিবাসীরা তো হাসবে!'

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'বাইরের জৌলুশ দিয়ে আর কী করবেন? ভিতরটা আপনার ইচ্ছেমতো সুশ্রী ক'রে নিন।' আর্দা কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে তাতেই রাজি হ'লেন।

বার্বিকেন মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন, লোহার স্প্রিং হাজার ভালো হ'লেও তাতে কাজ চলবে না। তাই তিনি জলের ব্যবস্থা

করেছিলেন। গোলার ভিতর তিন-ফুট জল ঢালা হ'লো, সেইট জলের উপর রইলো একটি কাঠের চাক্তি। চাক্তিটা গোলার গায়ে এমনভাবে লাগানো হ'লো যাতে ইচ্ছেমতো খোলা যায়। ঐ চাক্তিটার উপর বার্বিকেন যাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জলকে কয়েকটা থাকে-থাকে ভাগ করবার জন্য জলের মধ্যে পর-পর কতোগুলো কাঠের চাক্তি রাখা হ'লো। সবচেয়ে উপরে থাকলো যাত্রীদের বসবার চক্র, আর তার নিচেই রাখা হ'লো খুব শক্ত স্প্রিং।

বার্বিকেন বুঝেছিলেন যে, কামানের মুখ থেকে গোলাটা ছিটকে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে-সাংঘাতিক ধাক্কা লাগবে তাতে কাঠের চাক্তিগুলি একে-একে ভেঙে গিয়ে এক থাকের জল অন্য থাকের জলের সঙ্গে মিশে যাবে, কাজেই যাত্রীদের কোনো ধাক্কা সহ্য করতে হবে না। গোলা ছুঁড়লে সব-আগে সুমুখের দিকে, আর পরে পিছনে ধাক্কা লাগবার কথা। জলের এই অদ্ভুত স্প্রিং থাকবার জন্য সামনের ধাক্কা যে লাগতে পারবে না বার্বিকেন তা ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছিলেন। পিছনের ধাক্কায় যাতে কোনো কিছু না-হয় তার জন্য খুব ভালো জাতের লোহার স্প্রিং-এর উপর নির্ভর করতে হ'লো। গোলার ভিতরটা ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো নরম অথচ সহজে যাতে না ছেঁড়ে এমন ধরনের স্প্রিং-এর উপর পুরু কুশন বসিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এতো সব আয়োজন দেখে মাইকেল আর্দাঁ বললেন, 'এতো ক'রেও যদি ধাক্কা লেগে হাড়গোড় ভাঙে, তাহ'লে ভাঙুক: আমার কোনো আপত্তি নেই।'

গোলার ভিতরে ঢোকবার দরজা বানানো হয়েছিলো ক্রমসূক্ষ্মমান ঊর্ধ্বদিকে। যাতে ভিতর থেকে খুব শক্ত ক'রে দুয়ার বন্ধ করা যায়, বার্বিকেন মনোযোগ দিয়ে সে-ব্যবস্থা করেছিলেন। যাতে আচমকা কোনো ঝাঁকুনি লাগলে দরজা খুলে না যায় সেইজন্য বৈদ্যুতিক বোতামের ব্যবস্থা করা হ'লো।

গোলার ভিতরে ক'রে চাঁদে গেলেই তো আর হ'লো না, যাবার পথে মহাশূন্যের অবস্থাও দেখতে হবে, নইলে চাঁদে গিয়ে আর লাভ কী? সে-জন্যে স্প্রিং-এর কুশনের নিচে চারটে কাচের জানলা বসানো হয়েছিলো। দুটো জানলা দু-পাশে, একটা উপরে আর একটা নিচে,—এর ফলে মহাকাশে চলবার সময় ছেড়ে-আসা পৃথিবী, ক্রমনিকটমান চন্দ্রলোক এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত অসীম জ্যোতিষ্কলোক পর্যবেক্ষণ করবার আর কোনো অসুবিধে ছিলো না। এই কাচগুলো যাতে বায়ুর চাপে না-ভেঙে যায়, সে-জন্যে ধাতুর আবরণ দিয়ে সেগুলি এমনভাবে ঢাকা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিলো যে গোটাকয়েক স্ক্রু খুললেই জানলার কাচের উপর থেকে ঐ আবরণ সরে যেতো।

গোলাটায় যাতে আলো আর তাপের অভাব না-হয় সেজন্য খুব বেশি ক'রে গ্যাস নেয়া হ'লো। একটি নলের মুখ খুলে দিলেই গ্যাস বেরোতো। বার্বিকেন এক সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য, পানীয় এবং গ্যাস নিলেন; কোনোরকমে বেঁচে থাকবার জন্য যা দরকার, শুধু তাই যে গোলায় নেয়া হ'লো এমন নয়, যাতে বেশ আরামেই থাকা যায় তারও ব্যবস্থা করা হ'লো। যদি প্রচুর জায়গা থাকতো তাহ'লে মাইকেল আর্দাঁ নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় সুকুমার শিল্পের একটি আস্ত জাদুঘরই সঙ্গে ক'রে নিতেন।

খাদ্য, পানীয়, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যখন শেষ হ'লো, তখন এলো বাতাসের পালা। গোলার ভিতর যে-টুকু স্বাভাবিক বাতাস ছিলো, তা যে তিনজনের পক্ষে চারদিনের উপযোগী ছিলো, তা নিশ্চয় না বলে দিলেও চলবে। বার্বিকেনের সঙ্গে আবার চলেছিলো তাঁর বাধা কুকুরদুটি। কাজেই পাঁচটি প্রাণীর জন্য চব্বিশ ঘণ্টায় ন্যূনপক্ষে সাড়ে তিন সের ক'রে অক্সিজেনের দরকার। একুশ ভাগ অক্সিজেন আর উনআশি ভাগ এজোট মিশোলেই বাতাসের জন্ম হয়। আমরা যখন নিশ্বাস নিই তখন শরীরে প্রবেশ

করে অক্সিজেন, আর প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরোয় এজোট। বদ্ধ জায়গায় কিছুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চললেই বাতাসের অক্সিজেন ফুরিয়ে কেবল থাকে কার্বনিক এসিডের গ্যাস। কার্বনিক এসিড মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষ। বার্বিকেন দেখলেন, গোলার ভিতর যেটুকু অক্সিজেন লাগবে তা তৈরি ক'রে পরে জ'মে-যাওয়া কার্বনিক এসিডের গ্যাস বিনষ্ট ক'রে ফেলতে পারলেই গোলায় আর বাতাসের অভাব হবে না।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেলো, ক্লোরেট অব পটাশ আর কস্টিক পটাশ ব্যবহার করলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, চারশো ডিগ্রি উত্তাপে ক্লোরেট অব পটাশ রূপান্তরিত হয় ক্লোরিন অব পটাশিয়ামে, আর তার ভিতর যে অক্সিজেন থাকে তা বেরিয়ে পড়ে। ন-সের ক্লোরেট অব পটাশে সাড়ে তিন সের অক্সিজেন পাওয়া যায়: চব্বিশ ঘণ্টার জন্য একজনের পক্ষে সাড়ে তিব সের অক্সিজেনই প্রচুর। বাতাসে যে কার্বনিক এ্যাসিড থাকে ক্লোরেট অব পটাশ তা সব সময়েই টেনে নেয়, কাজেই খুব বেশি ক'রে ক্লোরেট অব পটাশ আর কস্টিক পটাশ নেবার ব্যবস্থা করা হ'লো।

ম্যাটসন বললেন, 'যদিও বিজ্ঞান বলেছে যে এরপর গোলার ভিতর আর বাতাসের অভাব হবে না, তবুও একবার হাতে কলমে যাচাই ক'রে নেয়া ভালো নয় কি?'

সবাই এ-প্রস্তাবে সায় দিলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। এ কথা ঠিক। একবার পরখ ক'রে দেখা নিঃসন্দেহে ভালো।'

তখন এক সপ্তাহের উপযোগী খাদ্য, পানীয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্লোরেট অব পটাশ আর কস্টিক পটাশ দিয়ে ম্যাটসনকে গোলার ভিতরে আটকে রাখা হ'লো। সাত দিন পর সবাই খুশি হ'য়েই দেখতে পেলো, ম্যাটসন বহাল তবিয়তেই আছেন গোলাতে। বার্বিকেন অবশ্য পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্য ম্যাটসনকে ওজন করলেন। সবিস্ময়ে সবাই দেখলেন, ম্যাটসনের ওজন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে।

১৪

চাঁদকে লক্ষ্য ক'রে গোলাটা ছোড়বার পর যাতে পৃথিবী থেকে গোলার গতি দেখতে পাওয়া যায়, প্রথম থেকেই বিজ্ঞানীরা সে চেষ্টা করছিলেন। চাঁদ যদি উনচল্লিশ মাইল উপরে থাকতো, তাহ'লে চাঁদকে খালি চোখে যে-ভাবে দেখা যেতো, তখনকার দূরবীন দিয়ে তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট দেখবার সম্ভাবনা ছিলো না। আর চাঁদের তুলনায় কামানের গোলা তো ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র, ছোট্টো একটি বিন্দু। সেই বিন্দু তীব্রগতিতে মহাকাশে ছুটে চলেছে—এ দৃশ্য দেখতে হ'লে দূরবীনকে আরো শক্তিশালী করা দরকার, বৈজ্ঞানিকেরা সে-জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। এর আগে যে যন্ত্রে কোনো কিছুকে ছ-হাজার গুণ বড়ো ক'রে দেখা যেতো, তার ক্ষমতাকে কম ক'রে আরো ছ-গুণ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছিলো। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা যে-দূরবীন বানালেন, তার নলচেটিও হ'লো ছ-শো ফুট লম্বা। নলচের ভিতরে দূরের জিনিশ দেখবার জন্য যে কাচ বসানো হ'লো তার ব্যাস ষোলো ফুট।

পৃথিবীতে চন্দ্রালোক এসে পৌঁছোয় বায়ুস্তর পেরিয়ে। বায়ুমণ্ডল ভেদ ক'রে পৃথিবীতে আসতে গিয়ে চাঁদের আলো তার ঔজ্জ্বল্যের অনেকখানিই হারিয়ে ফেলে। সুতরাং দূরবীন যতো উঁচুতে স্থাপন করতে পারা যাবে, চাঁদের আলোকে আর সেই ততটুকু বায়ুমণ্ডল পেরোতে হবে না। কাজে কাজেই ঠিক হ'লো যে কেম্ব্রিজ মান-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ নতুন যে বিরাটকার দূরবীনটা বানিয়েছেন তা কোনো একটি উঁচু পাহাড়ের উঁচু চুড়োয় বসানো হবে। অনেক

তর্ক-বিতর্ক গবেষণার পর ঠিক হ'লো, যুক্তরাজ্যের রকি মাউন্টেনের চুড়োর উপর ঐ দূরবীন বসালে সুবিধে হবে; সমুদ্রতল থেকে সে-চুড়োর উচ্চতা হচ্ছে দশ হাজার সাতশো এক ফুট।

রকি মাউন্টেনের পথ ছিলো অতি দুর্গম। দুস্তর গিরি-নদী, দুর্ভেদ্য অরণ্য, প্রবল উৎরাই তার চুড়োর পথ বিপজ্জনক ক'রে রেখেছিলো। তার উপর নরখাদক জংলিরা তো আছেই। কিন্তু তবু কখনো যেখানে মানুষের পদার্পণের সম্ভাবনা ছিলো না, যন্ত্রপাতি নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারেরা সেখানে গিয়েছিলেন দূরবীন বসাতে। বহুদিন প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রে সুউচ্চ এক লৌহস্তম্ভের উপর সেই বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো হলো।

সবই যখন ঠিকঠাক হ'য়ে গেলো, তখন স্টোনিহিল-এ ভারে ভারে বারুদ আসতে লাগলো। একসঙ্গে যদি দশ হাজার মণ বারুদ স্টোনিহিলে আনানো হ'তো, তাহ'লে কারো সামান্য অসাবধানতায় মহাপ্রলয় ঘ'টে যাবার সম্ভাবনা ছিলো। সেইজন্য বহু চিন্তার পর সাবধানী বার্বিকেন অল্প-অল্প ক'রে বারুদ আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্টোনিহিলের চারিদিকে দু-মাইলের ভিতর কোনো কারণেই আগুন জ্বালানো চলবে না—এই মর্মে সরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোলো। ইঞ্জিনিয়ারেরা পর্যন্ত খালি পায়ে কাজ করতে লাগলেন, যদি হঠাৎ জুতোর ঘসায় বারুদের কণা জ্ব'লে ওঠে। শুধু রাত্রিবেলায় বৈদ্যুতিক আলোয় কার্তুজ বানানো হ'তে লাগলো। কার্তুজগুলো একে-একে লোহার তারে জড়িয়ে অতি সাবধানে কামানের ভিতর স্থাপন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। কার্তুজের তারের সঙ্গে আরেকটি তার লাগিয়ে কামানের গায়ের একটি ছোট্টো ফুটো দিয়ে তার এক দিক বাইরে আনা হ'লো। স্টোনিহিল থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা শক্তিশালী বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়েছিলো, বহু লৌহস্তম্ভের মাথা দিয়ে শূন্যে ঝুলে সেই তারের সঙ্গে ঐ-যন্ত্রের সংযোগ স্থাপন করা হ'লো। বার্বিকেন স্থির

করেছিলেন, যথাসময়ে এই যন্ত্র দিয়ে বারুদে অগ্নিসংযোগ করা হবে।

বারুদের কার্তুজগুলো নিরাপদেই কামানে রাখা হ'লো; ক্যাপ্টেন নিকল আবার পরাজয় স্বীকার করলেন। তিন নম্বর বাজিতে হেরে গিয়ে ক্যাপ্টেন নিকল বার্বিকেনকে তিন হাজার তিনশো পঁচিশ ডলার বের ক'রে দিলেন।

১৫

মাইকেল আর্দার তখন একটুও অবসর ছিলো না। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত নিয়মমতো করতে পারছিলেন না, এতো ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছিলো। নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র জড়ো করছিলেন তিনি: ব্যারোমিটার, দূরবীন, পৃথিবীর মানচিত্র, বন্দুক, গোলা-বারুদ, শাবল, কুঠার—আরো কত জিনিশ যে তিনি গোলার মধ্যে তুললেন তার ইয়ত্তা রইলো না। যেমন অতিরিক্ত ঠাণ্ডার উপযোগী পোশাক-আশাক নেয়া হ'লো, তেমনি আবার ভীষণ গরমে গায়ে দেবার জামা-কাপড়েরও ব্যবস্থা করা হ'লো। ছোটো-ছোটো কৌটোয় নানা ধরনের ফসলের বীজ নেয়া হ'লো; মাংস এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যকে যন্ত্রের সাহায্যে ছোট্টো সুপুরির মতো বানিয়ে তোলা হয়েছিলো। আর্দা এই বিশেষ ধরনে প্রস্তুত খাদ্য নিলেন দু-মাসের উপযোগী, এবং স্থির হ'লো সেই পরিমাণ পানীয় নেওয়া হবে।

জলের স্প্রিং-এর উপর যেভাবে আসনগুলি বসাবার পরিকল্পনা হয়েছিলো, সেই অনুযায়ীই এই কাজ সমাপন করলেন বার্বিকেন। বাতাসের অভাব দূর করবার জন্য দু-মাসের উপযোগী ক্লোরেট অব পটাশ আর কস্টিক পটাশ নেয়া হ'লো।

ক্যাপ্টেন নিকল কিন্তু একরোখার মতো তখনো ব'লে চলছিলেন, 'উঁহু। যাই করুন না কেন, গোলা কিন্তু কিছুতেই চলছে না।'

বার্বিকেন মৃদু হেসে জিগেস করলেন, 'কেন চলবে না?'

ক্যাপ্টেন নিকল মৃদু হেসে বললেন, 'আস্তে-আস্তে গোলাটার

ওজন কতো বেড়ে উঠছে দেখছেন? অতো ভারি গোলাটা কামানের মধ্যে রাখতে গেলেই সমস্ত কার্তুজগুলো একসঙ্গে জ্ব'লে উঠে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে বসবে।'

এ-কথা শুনে বার্বিকেন গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক।'

আগেই নির্দেশ দিয়ে খুব মজবুত একটি কপিকল আনানো হয়েছিলো। কপিকলটার শেকলগুলো খুব সাবধানে পরীক্ষা ক'রে যখন গোলাটা তোলবার ব্যবস্থা করা হ'লো, তখন গান ক্লাবের সকল সদস্যের মনে যে কী-রকম উৎকণ্ঠ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো, তা ব'লে বোঝানো যাবে না। কেউ-কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'শেকলটা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে না যায়: যদি ছিঁড়ে যায় তাহ'লে তো সর্বনাশ! বিদ্যুৎবেগে গোলটা গিয়ে পড়বে কামানের তলায়, আর তক্ষুনি সেই আকস্মিক আঘাতে কার্তুজগুলো জ্বলে উঠবে। তারপর —উঃ, ভাবতেও কী সাংঘাতিক।

খুব আস্তে-আস্তে কপিকলের হাতল ঘুরিয়ে সেই মস্ত গোলাটাকে কামানের মধ্যে নামানো হতে লাগলো: আস্তে-আস্তে গোলাটা ঢুকতে লাগলো পাতালে, তারপর ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হয়ে গেলো। সবাই রুদ্ধশ্বাসে শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু না, কোনো দুর্ঘটনাই ঘটলো না। গোলাটা নির্বিঘ্নে যথাস্থানে গিয়ে বসলো।

ক্যাপ্টেন নিকল টাকা নিয়ে বার্বিকেনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বার্বিকেনের করমর্দন ক'রে অভিনন্দন জানালেন তিনি, 'আরেকটা বাজিও হারলুম। এই নিন তার টাকা।'

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'না, না, ও কী করছেন? আপনি তো এখন আমাদেরই একজন। আপনার কাছ থেকে কি বাজির টাকা নেয়া চলে?'

'কেন নেয়া যাবে না?' নিকল বললেন, 'নিশ্চয়ই নেয়া যাবে।

বাজি—চিরকালই বাজি। এর মধ্যে আবার আপন-পর কী? নিজের কথা ঠিক রাখতে হবে তো? কথা যখন দিয়েছি একবার, তখন—এই নিন, টাকা নিন।'

বার্বিকেন টাকার থলি হাতে নিয়ে বললেন, 'তাহ'লে আপনি বাকি দুটো বাজির টাকাও দিয়ে দিতে পারেন, কেননা সে-দুটোও তো আপনাকে হারতে হবে।'

ক্যাপ্টেন নিকল বললেন, 'সে-বিষয়ে কিন্তু আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আর সন্দেহ আছে ব'লেই তো বাজি ধরেছি। সুতরাং আগে হেরে নিই, তারপর বাজির টাকাটা দেয়া যাবে। কী বলেন?'

১৬

বেতার-মারফৎ ঘোষণা ক'রে দেখা হয়েছিলো, পয়লা ডিসেম্বর রাত্রি দশটা চেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের সময় গান-ক্লাবের বাগানে সেই অদ্ভুত গোলা ইস্পে বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল এবং মাইকেল আর্দাঁকে নিয়ে চাঁদের দিকে ছুটে চলবে,—আমেরিকা আর ফ্রান্স একসঙ্গে যাবে চন্দ্রলোক দখল করতে। হয় সে-দিনই যেতে হবে, নয়তো আবার আঠারো বছর এগারো দিন পরে।

সমস্ত পৃথিবী বেতারের পরবর্তী ঘোষণার অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। যারা পারলো, তারা তো আমেরিকাতেই চ'লে এলো স্টোনিহিলে. যারা পারলো না, তারা আর কী করে? বেতারের চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুর্বহ প্রতীক্ষায় বসে রইলো।

অবশেষে একদিন এলো সেই বহু প্রতীক্ষিত পয়লা ডিসেম্বর।

সূর্যোদয়ের আগে স্টোনিহিলের চারপাশে অজস্র লোক জমায়েত হয়েছিলো। যে-দিকে তাকানো যায়, জনসমুদ্রের উদ্বেলিত তরঙ্গ দেখা যায়. সকলেই উৎকণ্ঠ হয়ে আছে রাত্রি দশটা চল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ডের জন্য।

তার প্রায় এক সপ্তাহ আগেই স্টোনিহিলের চারদিকে অজস্র তাঁবু খাটানো হয়েছিলো, যেন এক তাঁবুর নগর। সারি সারি দোকান, সরাইখানা, রেস্তোরাঁ সব তাঁবুর মধ্যে। পয়লা ডিসেম্বর ভোর হ'তে-না-হ'তেই কোনোখানে আর সূঁচ ফেলবার জায়গা রইলো না। পনেরো মিনিট অন্তর সেই তাঁবুর শহরে হাজার হাজার লোক নিয়ে আসতে লাগলো রেলগাড়ি। বার্বিকেন

তো খুশি গলায় সেই তাঁবু-শহরের নাম রেখে দিলেন, 'সিটি অব-মাইকেল আর্দা'।

'সিটি অব মাইকেল আর্দা'য় জমা হয়েছিলো পৃথিবীর সব দেশেরই লোক, কথোপকথন চলছিলো পৃথিবীর সব ভাষাতেই, লোক জমা হয়েছিলো সকল বয়সেরই।

তারপর আস্তে-আস্তে কুয়াশা-মাখা সন্ধ্যা নামলো 'সিটি অব মাইকেল আর্দা'য়। সাতটার সময় আকাশে দেখা গেলো সকল উত্তেজনার মূল সেই চাঁদকে। নির্মেঘ আকাশের সোনালি চাঁদ, তার স্ফটিক জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিলে। কান পর্যন্ত টানা ধনুকের ছিলার মতো প্রতীক্ষারত জনতা চাঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করলে সমবেত গলায়। এই তারিখের আগে লোকে কতবার চাঁদকে দেখেছে, কতো পূর্ণিমার রাতে না ঘুমিয়ে উৎসব করে কাটিয়েছে; কিন্তু কই, চাঁদকে তো অতো সুন্দর কখনো দেখা যায়নি! চাঁদকে সেদিন মনে হলো পরমাত্মীয়: অনিমেষ চক্ষে সবাই দেখতে লাগলো চাঁদকে। কেবল চাঁদেরই দীর্ঘজীবন কামনা করলে না তারা, দীর্ঘজীবন কামনা করলে গান ক্লাবের, বার্বিকেনের, নিকলের, মাইকেল আর্দার।

লক্ষ-লক্ষ লোকের গলার আওয়াজে কেঁপে উঠলো স্টোনিহিল, টম্পা, ফ্লোরিডা—কেঁপে উঠলো সমস্ত যুক্তরাজ্য। স্টোনিহিলের গিরি-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হলো লক্ষ কণ্ঠস্বর: 'ভিভ লা ল্যুন— 'চন্দ্রলোক জিন্দাবাদ'!

১৭

রাত দশটার সময় মাইকেল আর্দাঁ, ক্যাপ্টেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেন হাসতে-হাসতে কামানের কাছে এসে দাঁড়ালেন। রেলগাড়িতে কোনো দূর বিদেশে যাবার সময় মানুষের যতোটুকু চাঞ্চল্য হয়, তাঁদের চোখ-মুখে সেটুকুও কেউ লক্ষ্য করতে পারলো না। তাঁরা গোলার মধ্যে ঢোকবার জন্যে তৈরি হলেন।

ম্যাটসন বললেন, 'বার্বিকেন, এখনো সময় আছে। আমি সঙ্গী হবো আপনার?'

'না ম্যাটসন, তা কী করে হয়?' বার্বিকেন বললেন, 'আমরা পৃথিবীর অগ্রদূত হ'য়ে আগে চাঁদে যাই। কামান তো রইলোই, পরে দরকার হ'লে তোমরা আমাদের কাছে পৃথিবীর খবর পাঠাতে পারবে।'

মাইকেল আর্দাঁ বললেন, 'মিস্টার বার্বিকেন কিন্তু ঠিক কথাই বলেছেন, ম্যাটসন। এই কাজটা করার জন্য আপনাকে পৃথিবীতে থাকতে হবে: আর কিছু না-হোক মাঝে-মধ্যে আপনি অন্তত খাদ্য-পানীয় তো পাঠাতে পারবেন।'

এ-কথা শুনে ম্যাটসন নিজেকে কোনোমতে সান্ত্বনা দিলেন। ঈষৎ উৎসাহিত গলায় বললেন, 'প্রত্যেক বছর বড়োদিনের সময় আপনারা খাদ্য ও পানীয় পাবেন, এবং সেইসঙ্গে পাবেন সমস্ত পৃথিবীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।' এই ব'লে ম্যাটসন কিছুটা উত্তেজিত হ'য়ে বন্ধুদের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলেন।

আর এক মুহূর্তও দেরি না-করে ক্যাপ্টেন নিকল, মাইকেল আর্দাঁ আর ইম্পে বার্বিকেন যন্ত্রের সাহায্যে গোলার ভিতর ঢুকলেন। সমবেত জনতার শোরগোলে কামানের নলচের ভিতরকার অন্ধকার

গমগম করছিলো। গোলার ভিতরে ঢুকে যেই তাঁরা ভালো ক'রে দরজা দিলেন, অমনি জমাট স্তব্ধতার মধ্যে অনুভব করলেন পৃথিবীর সঙ্গে প্রবল বিচ্ছেদ।

রকি-মাউণ্টেনের চুড়োয় দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন তখন নিষ্পলক চোখে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যতোই সেই চরম মুহূর্তটি কাছে আসতে লাগলো, জনতা ততোই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হ'তে লাগলো, যেন কোনো জাদুকরের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তাদের কথাবার্তা সব বন্ধ হ'য়ে গেলো, কান পর্যন্ত টানা ধনুকের ছিলার মতো স্পন্দনহীন হ'য়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগলো সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তের।

মার্চিসন নীরবে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন: দশটা ছেচল্লিশ। আর মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড। মার্চিসনের বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরছে। দশ—পনেরো—কুড়ি—পঁচিশ—ত্রিশ! আর দশ সেকেণ্ড মাত্র। উত্তেজনায় সমবেত জনসাধারণ একবার অস্ফুট একটি আওয়াজ ক'রে উঠলো। মার্চিসন শুনতে লাগলেন: পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাইত্রিশ, আটত্রিশ। মার্চিসনের হৃৎপিণ্ড একবার প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠলো, ডান হাত স্পর্শ করলো বৈদ্যুতিক বোতাম, বন্ধ হ'য়ে এলো নিয়মিত নিশ্বাস। উনচল্লিশ—চল্লিশ! রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড !!

যা ঘটলো তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। লক্ষ প্রবল বজ্র যদি একসঙ্গে ফেটে পড়তো জমাট স্তব্ধতায়, তাহ'লে যে আওয়াজ হ'তো, কামানের গর্জনের কাছে তা কিছুই না। হঠাৎ যেন কোনো আগ্নেয়গিরির ঘুমন্ত জ্বালামুখ ফেটে ছিটকে বেরিয়ে গেলো, কামানের নল থেকে আকাশ স্পর্শ ক'রে উঠলো লকলকে লাল আগুন, মুহূর্তের জন্য সারা যুক্তরাজ্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো সেই আলোয়, যেন আচমকা সূর্যোদয় হয়েছে।

সমস্ত যুক্তরাজ্য কেঁপে উঠেছিলো সেই প্রবল কামান-গর্জনে।

জনতার মধ্যে ছিটকে পড়লো বহু লোক; কে কার গায়ে পড়লো, কে কাকে পায়ের তলায় চাপা দিলে—প্রাণের ভয়ে পালাতে-পালাতে কে আছাড় খেয়ে মৃত্যুবরণ করলো, সে-খবর নেয় কে? ভীষণ চিৎকারে, ভয়-ধরানো আর্ত নিনাদে স্টোনিহিল যেন এক বিরাট মহাশ্মশান হ'য়ে উঠলো।

বাতাসে এমন আলোড়ন উঠেছিলো যে, তক্ষুনি প্রবল সাইক্লোন ব'য়ে গেলো দূরে-কাছে, যুক্তরাজ্যের নানা অঞ্চলে। ঘূর্নি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেলো হাজার-হাজার তাঁবু, বনে-প্রান্তরে চক্ষের পলকে ভেঙে পড়লো বহু গাছপালা, নতুন-গড়ে-ওঠা টম্পার বাড়িঘর ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো, রেল লাইন থেকে চলন্ত রেলগাড়ি কাত হ'য়ে ছিটকে পড়লো মাঠে, বন্দরের জাহাজগুলোর শেকল ছিঁড়লো, নোঙর খসলো, আছড়ে পড়লো তারা মহাসমুদ্রে। ফেনিয়ে-ধোরা চাকজল যে কতো জাহাজকে ছোট্ট পুতুলের মতো লুফতে-লুফতে শেষটায় ডুবিয়ে দিলো, তার সঠিক সংখ্যা জানা গিয়েছিলো বহুকাল পরে।

সেই রাত্রে চাদ উঠেছিলো নিটোল গোল ছড়িয়ে দিয়েছিলো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নাধারা; কিন্তু সেই মুহূর্তে পলকের মধ্যে সেই সোনালি চাঁদ ঢাকা প'ড়ে গেলো মেঘে। কালো ধোঁয়া আর মেঘ ভেদ করে কারো দৃষ্টি চললো না। বিশেষভাবে-তৈরি-করা সেই প্রবল শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত কামানের গোলাটির কী হ'লো, তা জানা গেলো না ঐ মেঘ আর ধোঁয়ার জন্য

পরদিন ভোরবেলাতেও আকাশ রইলো মেঘলা, অন্ধকার। দুপুরবেলাতে মানুষ সামান্যতম সূর্যালোক দেখতে পেলো না কেউ। রাত্রির কালো আকাশে সেদিন একটানা চললো পাগলা ঝড়ের মাতামাতি।

তার পরদিন বেতারে ঘোষণা করা হ'লো: 'কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, কামানের গোলা প্রচণ্ড বেগে চাঁদের দিকে ছুটে চলেছে!

দ্বিতীয় খণ্ড

১

বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর আওয়াজ কাঁপিয়ে দিলো মাটি, আকাশ ছুঁলো আগুনের টকটকে হলকা। বৈদ্যুতিক কলটির বোতাম টিপেছিলেন ম্যাটসন। বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ছিটকে পড়লেন দূরে, কিছুক্ষণের জন্য তাঁর চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেলো।

আকাশ ঢাকা পড়লো ধোঁয়ায়, মেঘ জমলো। অমাবস্যার অন্ধকারের মতো, স্টোনিহিলের লোকারণ্য কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে! কেবল স্টোনিহিলই কাঁপলো না, কাঁপলো টম্পা-ও, এবং সমস্ত যুক্তরাজ্য। সমুদ্রে লাফিয়ে উঠলো জল, ফেনিয়ে ঘুরলো চরকিবাজির মতো। সবাই যখন সংবিৎ ফিরে পেলো প্রথমেই তাকালো আকাশের দিকে। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা গেলো না। কোন মহাশূন্যে তখন গোলকটি ছুটে চলেছে, কে জানে!

গান-ক্লাবের তৈরি সেই যাত্রীবাহী গোলকটি কিন্তু তখন দূর পাল্লার অভিযানে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছিলো চাঁদের দিকে। যে-চাঁদের দিকে তাকিয়ে এতকাল মায়েরা ঘুম-পাড়ানি গেয়ে শোনাতেন ছেলেমেয়েদের, সেই চাঁদ শেষ পর্যন্ত মানুষের দখলে আসতে চললো। জ্যোতির্বিদরা যাকে মহাশূন্যের অন্যতম বিস্ময় বলে মনে করতেন, সেই চাঁদ আজ জয় করতে চললো পৃথিবীর তিনজন মানব যাত্রী।

ঊর্ধ্বে, পৃথিবীর অনেক উপরে, দূর আকাশের কোলে, মহাশূন্যে গ্রহজগতের অন্যতম বিস্ময়ের রাজ্য: চাঁদ। কী সেই চাঁদের ইতিহাস? কারা থাকে চাঁদে? চাঁদ কি সত্যিই বাসযোগ্য? কে জানে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সেই উপগ্রহে। শেষ

পর্যন্ত চাঁদ জয় করতে চলেছে দুঃসাহসী মানুষ, যে একদিন থাকতো গুহায়, চোখা পাথরের হাতিয়ার দিয়ে হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই ক'রে, নির্মম প্রকৃতির প্রতিরোধ চুরমার ক'রে যে আত্মরক্ষা করতো, যে বানিয়েছে বিচিত্রবীর্য বিজ্ঞান, দীপ্তিময় দর্শন, আলোকপ্রাপ্ত সাহিত্য।

এইসব বিষয়েই বললো সমস্ত খবরের কাগজগুলি, যখন কেম্ব্রিজ মানমন্দির দু-দিন পর ঘোষণা করলো গান-ক্লাবের বিশাল গোলকটিকে তীব্রবেগে মহাশূন্যে ছুটে চলতে দেখা যাচ্ছে। গোলকটির লক্ষ্য পৃথিবীর বহু-আলোচিত উপগ্রহ: চন্দ্র'। এই সমস্ত সংবাদের শিরোনাম হ'লো বড়ো বড়ো হরফে:

'পৃথিবীর প্রথম বিস্ময়!

গান ক্লাবের গ্রহান্তর অভিযান।

চন্দ্রলোক অভিমুখে প্রথম তিনজন মানব যাত্রী!!!

এবং তারপরে সবিস্তারে বিবৃত করা হ'লো সেই চমকপ্রদ কাহিনী

২

পৃথিবীর আলো বাতাস আকাশ-মাটি মানুষ-জন— সবকিছুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই বিশাল গোলকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন অধ্যাপক আর্দাঁ, ক্যাপ্টেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সঙ্গে তাঁরা সঙ্গে নিলেন বার্বিকেনের প্রিয় কুকুরছুটি, নেপচুন এবং সাটেলাইটকে।

গোলার ভিতরে ঢুকে প্রথমে সবাই কিছুক্ষণ নির্বাক হ'য়ে থাকলেন। শুধু যে বলবার মতো কোনো কথা না পেয়েই তাঁরা চুপচাপ রইলেন তা নয়, এমনিতেই তাঁরা কথা বলতে চাচ্ছিলেন না, ইচ্ছেই হচ্ছিল না কিছু বলবার। কিন্তু এই রকম উৎকণ্ঠ অবস্থায় বেশিক্ষণ আবার চুপচাপ থাকা যায় না, তাই এক সময়ে কাঁচি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নীরবতা ভেঙে অধ্যাপক আর্দাঁ বললেন, আর মাত্র তিন মিনিট বাকি, তারপরই আমাদের নিয়ে গোলাটি শূন্যে ছিটকে বেরোবে।'

'আমরা তবে সত্যিই চন্দ্রলোকে চলছি?' ক্যাপ্টেন নিকলের যেন অবস্থাটা কিছুতেই বিশ্বাস হ'তে চাচ্ছিলো না, সে-কথা তিনি মুখ ফুটে জানালেনও: 'আমার তো এখনো সত্যি বিশ্বাসই হ'তে চাচ্ছে না!'

কেবল ইম্পে বার্বিকেনের চোখ-মুখেই খুশির আভা ঝিলকিয়ে উঠছিলো। একটু হেসে তিনি বললেন, 'কী ক'রে হবে বলুন? চাঁদে গোলা পাঠাবার কথা কল্পনা করলেও আমি নিজে তো স্বপ্নেও ভাবিনি চাঁদে পদার্পণ করবার কথা। আমার তো মনে হয় না মঁসিয় আর্দাঁ ছাড়া আর-কারো মগজে এমন আশ্চর্য ইচ্ছে গজাতো। তবে আমরা শেষ পর্যন্ত চাঁদে যদি না-ও পৌঁছতে পারি, তবু আমি

এই জেনেই খুশি যে, আমার এতোদিনের স্বপ্ন শেষটায় আজ সফল হ'তে চলেছে।'

'আপনারা না-হাসলে আমি সত্যি কথাটা বলতুম, হালকা গলায় মাইকেল আর্দা জানালেন, 'আমার কিন্তু এখন ছোটোদের মতো নাচতে ইচ্ছে—'

অধ্যাপক আর্দা মুখের কথা আর শেষ করতে পারলেন না। আচমকা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো গোলাটা, যেন বাইরে শুরু হয়েছে এক প্রবল প্রলয়। আসন থেকে তীব্র বেগে ছিটকে পড়লেন তিনজনে। এতো জোরে তিনজনে ধাক্কা খেলেন মজবুত দেয়ালের গায়ে যে, ঝিমঝিম ক'রে উঠলো মাথা, যেন সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে চাচ্ছে। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপশা হ'য়ে এলো, কে যেন পাৎলা একটা কুয়াশার চাদর দিয়ে সবকিছু ঢেকে দিয়ে গেলো।

যদিও মাথাটা এখনো ঝিম-ঝিম করছিল, তবুও সংবিৎ প্রথম ফিরে পেয়েছিলেন অধ্যাপক আর্দা। গোলকের মধ্যে কোনো রকমে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে তিনি নিস্তেজ গলায় বললেন, 'শেষকালে এই সামান্য বিস্ফোরণ কিনা আমার সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিলো!'

নিজেকে একটু সামলে কোনো রকমে স্থির হ'য়ে দাড়ালেন আর্দা। দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন নিকল মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছেন। তাঁকে ধরে ওঠাবার চেষ্টা করলেন আর্দা। তাঁর হাতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে করুণ স্বরে ক্যাপ্টেন নিকল জিগেস করলেন, 'আমি কোথায় আছি, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'নিজেকে মহাশূন্যের অভিযাত্রী ব'লে ভাবতে নিশ্চয়ই খুব বেশি দেরি হবে না আপনার। এ-সব বিষয়ে চট ক'রেই অভ্যস্ত হ'য়ে যাওয়া যায়, কেননা পদে-পদেই খুব ক'রে প্রমাণ পাওয়া যায় তো কোনখানে আছি। আর্দা ঠাট্টা করলেন, 'এবার আসুন

তো শিগগির, বার্বিকেনের কী দশা হ'লো, আবিষ্কার করে দেখি।'

তাঁদের সাহায্যে কোনোরকমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে বার্বিকেন বললেন, 'সত্যি বলতে, আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিলো। সব ঝাপসা হ'য়ে গিয়েছিলো চোখের সামনে। এখন অবিশ্যি কোনো রকমে সামলে নিয়েছি। গ্রহান্তর অভিযানের ইতিহাসে প্রথম অভিযাত্রী ব'লে যেহেতু আমাদের নাম উজ্জ্বল-চিহ্নিত হবে, সেজন্যই এমনভাবে নেতিয়ে পড়লে আমাদের চলবে না। দেখুন তো ক্যাপ্টেন নিকল, কদ্দুর এগোনো গেলো এর মধ্যে!'

ক্যাপ্টেন নিকল বললেন, 'ঠিক আন্দাজ করতে পারছি না। আমরা এখন গোলকের ঠিক মধ্যখানে। একটা জিনিশ কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য ঠেকছে। বিস্ফোরণের কোনো শব্দই আমি শুনতে পাই নি।'

একটি ঘন পুরু কাচের জানলার উপরকার ধাতুর আবরণী উন্মোচন করতে করতে মাইকেল আর্দা বার্বিকেনকে আহ্বান করলেন, 'দেখুন তো মিস্টার বার্বিকেন, বাইরে এখন কোনো কিছু দ্রষ্টব্য আছে কি না।'

'কী প্রচণ্ড বেগে আমরা পৃথিবী ছাড়িয়ে চলেছি!' সাফল্যের আলোয় বার্বিকেনের চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো : 'শেষ অবধি সত্যি-সত্যিই চাঁদে চলেছি আমরা?'

'আচ্ছা বার্বিকেন, এই ব্যাপারটার মানে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন?' ক্যাপ্টেন নিকল আবার জিগেস করলেন, 'আমাদের আকাশ-যান তো কামানের নলচের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কোনো শব্দ কেন শুনতে পাওয়া গেলো না?'

একটু ভেবে বার্বিকেন আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি! বুঝতে পেরেছি কেন আমরা বিস্ফোরণের কোনো শব্দই শুনতে পাইনি!...আসল ব্যাপারটা কী, জানেন ক্যাপ্টেন নিকল?

শব্দের যে-গতি, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে ছুটে চলেছি। আমাদের আকাশ-যানের গতি হ'লো সেকেণ্ডে বারো হাজার ফুট। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই শব্দ আমাদের নাগাল পায়নি,—এবং বলাই বাহুল্য শব্দ কখনোই আমাদের নাগাল ধরতে পারবে না।'

'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত!' নিকল ব'লে উঠলেন।

'সমস্ত জীবনটা এইরকম তুমুল মুহূর্ত দিয়ে গড়া নয় ব'লেই এই মুহূর্তের সকল আনন্দ আপনি উপভোগ করতে পারছেন ক্যাপ্টেন নিকল। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে কি আর এতো আনন্দ হ'তো আপনার?' আর্দাঁ গম্ভীর না-হ'য়েই দার্শনিক হবার চেষ্টা করলেন।

বার্বিকেন ধারালো গলায় জানালেন, 'হারলে আমাদের চলবে না। যে-ক'রেই হোক না কেন, চাঁদ আমাদের জয় করতে হবেই।'

'মিথ্যে অতো ভাবছেন কেন?' বার্বিকেনকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করলেন নিকল 'খামকা অতো নিরাশ হবেন না। চাঁদ আমরা নিঃসন্দেহে জয় করবো। এতোদূর যখন এগিয়ে এসেছি তখন আমরা নিশ্চয়ই ব্যর্থতা বরণ করবো না!'

'এটা কেবল আমরা আশাই করতে পারি, ক্যাপ্টেন নিকল, কিন্তু অতোটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না।' অধ্যাপক আর্দাঁ বললেন, 'তীরের কাছে এসেও অনেক সময় তরী ডোবে। অজানা আকাশে পাড়ি চলেছে আমাদের। যে-আকাশে এতোকাল কল্পনার অবাধ বিহার চলতো, সেখানে আজ আমরা বাস্তবেই পাড়ি দিয়ে চলেছি। এতো উঁচু দিয়ে চলেছি যে মানুষের কল্পনা এখানে পৌঁছোয়নি কোনোদিন। না-জানা কতো-না বিপদ অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্যে, সুতরাং আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারি না।'

দু-চোখে প্রশংসা নিয়ে ক্যাপ্টেন নিকল বার্বিকেনকে অবলোকন করলেন। 'আপনার মতো প্রতিভার কাছে বাজি হেরেও গৌরব আছে! আমার আগেকার ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করবেন, বার্বিকেন।'

নিকলের করমর্দন করলেন বার্বিকেন। বললেন, 'কী যে বলেন আপনি! আপনার এবং অধ্যাপক আর্দাঁর সাহচর্যেই আমার স্বপ্ন আজ সফল হ'তে চলেছে।'

৩

এতোকাল যে-জ্যোতিষ্কমণ্ডলে কল্পনা বিহার করতো, আজ সেখানে মানুষ চলেছে। এর জন্য যা কিছু প্রশংসা, সব নিঃসন্দেহে গান-ক্লাবেরই প্রাপ্য ব'লে অজস্র অভিনন্দন-পত্র আসতে লাগলো সেক্রেটারি ম্যাটসনের কাছে। ম্যাটসন দস্তুরমতো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লেন অভিনন্দন-পত্র গ্রহণ করতে-করতে। কেবল আমেরিকার সবকটি গৃহ থেকেই নয়, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূব-পশ্চিমের সকল দেশ থেকেই অবিরল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আসতে লাগলো। এতো অজস্র চিঠি-পত্র বাছাই এবং বিলি করতে করতে ডাকঘরের লোকেরা পর্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

কিন্তু কেবল এতেই শেষ নয়। চন্দ্রযাত্রীদের খবর কী, এখন তাঁরা কোথায়, কী করছেন--ইত্যাদি বিষয় জানতে চেয়েও আরো অগুন্তি চিঠি এলো। 'কাজে-অকাজে কতো চিঠি যে লিখতে পারে লোকে—' এ কথা ভাবতে-ভাবতে ম্যাটসন মনে-মনে চ'টে উঠছিলেন। গান-ক্লাবের আকাশ-যানের কী হ'লো জানবার জন্য দূরবীক্ষণের কাছে বসবার সময় পাচ্ছিলেন না তিনি : ঐ চিঠিপত্র-গুলিকেই তিনি সমস্ত ঝামেলার মূল ব'লে মনে করেছিলেন। আসলে তিনি চিঠিপত্রগুলি নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না. তাই শিগগিরই সিদ্ধান্ত নিলেন, 'না, আর চিঠিপত্র দেখাশোনা নয়। কোথায় জরুরি কাজ নিয়ে বসবো, না যত্তোসব হ্যানো-ত্যানো! আসুক যতো চিঠিপত্র আসতে পারে ; ভ'রে যাক ঝুড়ির পর ঝুড়ি! এই যে আমি দূরবীনের কাছে গিয়ে বসছি, আর একচুলও নড়ছি না। ওঁরা রওনা হবার পর তিন দিন কেটে

গেলো, অথচ এর মধ্যে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের ঘোষণা ছাড়া ওদের সম্বন্ধে আর-কিছুই জানতে পারলুম না। উঁহু, আর এই চিঠির ঝামেলা ঘাড়ে নিচ্ছি না। এবার কেবল দূরবীক্ষণই সম্বল করতে হবে।'

আচম্‌কা বার্বিকেন আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ! কী ওটা? ঐ যে ওটা কী জিনিশ?'

অধ্যাপক আর্দাঁর গলায় ভয় ফুটলো। 'দেখুন! দেখুন! আমাদের মূর্তিমান ধ্বংস এগিয়ে আসছে!'

তিনজনেই হুড়মুড় ক'রে ব্যগ্রভাবে কাচের জানলার কাছে এগিয়ে এলেন, ভালো করে বাইরে তাকিয়ে দেখবার জন্যে।

'আমাদের গোলকের দিকেই যে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডটা।' ভয় পেয়ে কেঁপে গেলো ক্যাপ্টেন নিকলের গলা: 'সোজাসুজি এ-দিকেই আসছে দেখছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো ওটার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবে! আর আমাদের রক্ষা নেই, ধ্বংস অনিবার্য।'

যে-ভয়ংকর আগুনের গোলাটা দেখে তিনজনে আঁৎকে উঠলেন, সেটি হ'লো পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণমান জ্বলন্ত ধাতুপিণ্ডগুলোর একটি। মহাশূন্যে পৃথিবীর চারপাশে কেবলই আবর্তন করেছে অসংখ্য ছোটো-ছোটো ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি। তারই একটি ছিটকে আচম্‌কা এই আকাশ-যানের গতিপথে ছুটে এসেছে। কক্ষচ্যুত ঐ জ্বলন্ত উল্কাটির সঙ্গে সংঘাত না-ঘটে আর যায় না! এবং এই সংঘাতের একটিই শুধু মানে হ'তে পারে, সোজা ভাষায় যাকে বলা যায়, মৃত্যু। একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে গান-ক্লাবের এই বিরাট গোলকটি, যদি একবার ধাক্কা খায় ঐ উল্কাটির সঙ্গে।

বিজ্ঞানের গৌরবময় অভিযানে অংশ নিতে গিয়ে যুগে-যুগে এমনি ভাবেই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের এই প্রবল ভীষণ

বিনাশকে অবলম্বন ক'রেই যুগের পর যুগ ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে সভ্যতার আকাশস্পর্শী প্রাসাদ।

ব্যগ্র গলায় ক্যাপ্টেন নিকল শুধোলেন, 'এখন তাহ'লে উপায়?

'উপায়?' করুণভাবে হাসলেন বার্বিকেন: 'ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া এই মুহূর্তে আর-কোনো উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কাছে অবশ্যি অনেকগুলি হাউই আছে, এবং বিশেষভাবে তৈরি ব'লে তাদের শক্তিও প্রচুর। এই হাউইগুলির সাহায্যে হয়তো আমাদের আকাশ-যানের গতিপথ বদলে নিয়ে বাঁচবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস করা যেতো: কিন্তু এখন তো সেই হাউইগুলি ব্যবহার করবার মতোও সময় নেই! দেখছেন না কী প্রচণ্ড বেগে উল্কাটা আমাদের গোলার কাছে এসে পড়েছে!'

আর্দা জিগেস করলেন, 'এখন তাহ'লে কী করা যায়?'

'কেবল মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কিছু আমরা করতে পারি ব'লে বোধ হচ্ছে না।' বার্বিকেন কথা বলায় ব্যস্ত থেকে উল্কাটিকে ভুলে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন: 'আমাদের এই গৌরবময় অভিযানের সমাপ্তি যে এমনভাবে ঘটবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।'

শুকনো একটুকরো হাসির রেখা ফুটলো আর্দার ঠোঁটে। 'ভেবে আর কী লাভ হবে বলুন! বিজ্ঞানের শহীদ হিশেবে অমর হ'তে চলেছি আমরা এবং সেজন্যে এখন আমাদের রীতিমতো আনন্দ করা উচিত।'

যদিও আর্দা মুখে এ-কথা বললেন, তবু এইরকম বিনাশের সম্মুখীন হ'তে তাঁর যে খুব ভালো লাগছিলো, এ-কথা মনে হ'লো না অন্যদের।

আকাশে যখন গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন, ফরাশি বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মাইকেল আর্দা এবং রিচমণ্ডের ক্যাপ্টেন নিকল মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছেন, তখন পৃথিবীতে···যুক্তরাজ্যের বাল্টিমোরে গান ক্লাবের অট্টালিকায় ব'সে ম্যাটসন দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশ-পথ পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

মার্চিসন জিগেস করলেন, 'বার্বিকেনদের খবর কী, বলুন তো? কী দেখতে পাচ্ছেন আকাশে? কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের ঘোষণা বাদে আর কিছুই তো শুনিনি ওঁদের সম্বন্ধে!'

'কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ম্যাটসন, 'ওদের যাত্রাকালীন বিস্ফোরণের ফলে যে-ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে আকাশ এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, এখনো কিছু ধোঁয়া জমে আছে আকাশে। আর, আমার এই দূরবীক্ষণের ক্ষমতা অতোটা প্রবল নয়, যে, এই অপবিচ্ছন্ন ধোঁয়া ভেদ ক'রে আকাশ-যানটা দেখতে পাবো।'

'এখনো কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না?' মার্চিসনের গলায় আপশোশের বদলে একটু রাগই প্রকট হ'লো: 'কী জ্বালাতন! তাহ'লে ওঁদের কী হ'লো বুঝবো কী ক'রে?'

'অন্তত কিছুক্ষণ ধৈর্য ধ'রে না-থাকলে কিছুই বোঝা যাবে না। আগে আকাশ পরিষ্কার হোক, তারপর ওঁদের কী হ'লো বোঝা যাবে।'

'কোন সময়ে যে আকাশ পরিষ্কার হবে তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা দেখছি নে। হয়তো যখন আকাশ পরিষ্কার হবে, তখন ওঁরা চাঁদেই পৌঁছে গেছেন। আপনি বরং ভালো ক'রে চেষ্টা ক'রে দেখুন।'

'আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে খারাপ ক'রে দেখছি ?' মৃদু হাসলেন ম্যাটসন। মার্চিসনের এই ধৈর্যহীনতার কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, কেননা তাঁরও তো মনে ঐ রকমই কৌতূহল আর উত্তেজনা। তবু তিনি সমস্ত চাঞ্চল্য গোপন রাখবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'চোখের সামনে কেবল কালো মেঘের মাতামাতি। কেবল মেঘ, আর মেঘ : আর-কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আমার কিন্তু একটুও তর সইছে না।' মার্চিসন বললেন, 'আপনি বরং একটু স'রে বসুন। আমি নিজেই দেখি, কী ব্যাপার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দূরবীক্ষণের কাছ থেকে স'রে এলেন ম্যাটসন 'আপনাকে খুবই অল্পক্ষণের জন্য দেখবার সুযোগ দিচ্ছি, এ-কথা মনে রাখবেন। এক্ষুনি কিন্তু সরে বসতে হবে। আমি আর কিছুতেই এই দূরবীক্ষণ চোখ-ছাড়া করবো না।— আহা, আমাদের চর্মচক্ষু যদি কল্পনার মতো শক্তিধর হতো।

ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর হাজার মাইল উপরে মহাশূন্যে উল্কায় আর আকাশ-যানে সংঘর্ষ প্রায় ঘটে আর কি !

চক্ষের পলকে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো গান-ক্লাবের গোলকটি। মনে হ'লো বাইরে যেন প্রলয় শুরু হয়েছে। ভীষণ বেগে আসন থেকে ছিটকে পড়লেন তিনজনে। চোখের সামনে সব ঝাপশা হ'য়ে এলো ; চেতনাহীন তিনজন আকাশ-যাত্রী নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলেন আকাশ-যানের মেঝেয়।

কয়েক মিনিট পরে যখন সংবিৎ ফিরলো, তখন দারুণ অবাক হ'য়ে গেলেন তিনজনে। প্রথমটায় তো কোনো কথাই বলতে পারলেন না, বিস্মিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কেবল। তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে ছুটে এলেন কাচের জানলার কাছে বাইরে তাকাবার জন্য।

দূরে একটি সবুজ আলোর মতো জ্বলজ্বল করছে পেরিয়ে-আসা পৃথিবী, আর মহাশূন্যে এদিকে-ওদিকে হিরের মতো জ্বলছে অসংখ্য

নক্ষত্র। অনেক দূরে তাঁদের গন্তব্যস্থল চাঁদ তেমনি সোনালি আলো ছড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেন নিকলই প্রথম কথা বললেন, 'সত্যি তাহ'লে আমাদের মৃত্যু হয়নি ?'

জবাব দিলেন বাবিকেন, 'না। এমনকি উল্কাটার সঙ্গে সংঘর্ষ পর্যন্ত হয়নি। এ নিশ্চয়ই দেবতার দয়া, তাই শেষ মুহূর্তে আমাদের কিংবা উল্কাটার—কারো পরিক্রম-পথ কিছুটা বদলেছে। সংঘর্ষ না-বেধেই তো যেভাবে গোলকটি কেঁপে উঠেছিলো, তাতে বোঝা যায় সংঘর্ষ ঘটলে কী হ'তো !'

আর্দাঁ বললেন, 'ভবিষ্যতেও যে আপনার দেবতা এইভাবেই আমাদের বাঁচিয়ে দেবেন, সেই ভরশা আমি করতে পারছি না।'

'এবারে কিন্তু অলৌকিকভাবেই বেঁচে গিয়েছি আমরা। এ-রকম কোনো পরিত্রাণের কাহিনী মানুষের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই !' ক্যাপ্টেন নিকল নিশ্চয়ই আরো-কিছু বলতেন, কিন্তু আচমকা একটি মৃত্যু-কাতর আর্ত গোঙানি শুনে তিনি নির্বাক হ'য়ে গেলেন। করুণ সেই আর্তনাদ শিহরণ বইয়ে দিলো তাঁদের সর্বাঙ্গে। এই মহাশূন্যে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো কে ?

পর-মুহূর্তে আবারও কার করুণ গলার আর্ত স্বরে তাঁদের স্তম্ভিত পলক ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো। তারপর একটানা শোনা যেতে লাগলো একটি করুণ আর্ত গোঙানির সুর। নিকলের গলায় দারুণ ভয়ের লক্ষণ পাওয়া গেলো, 'এবারে আর রেহাই নেই আমাদের। এই ভুতুড়ে চিৎকার আসলে আমাদের মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ ঘোষণা করছে নিশ্চয়ই।'

'ঐ উল্কাটার প্রেতাত্মা কাঁদছে নাকি এইভাবে ?' বাবিকেনের গলায় কেবল ভয়ই নেই, বিস্ময়ও সুপ্রচুর। 'সামান্যর জন্য আমাদের লোকান্তরে পাঠাতে না-পেরে ঐ উল্কাটা ক্ষোভে দুঃখে কাঁদছে নাকি ?'

কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মতো দাঁড়িয়ে তিনজনে একটানা সেই অবাক ক্রন্দন শুনতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ কী মনে হ'তেই বার্বিকেন একটি মই বেয়ে আকাশ-যানের উপরের চত্বরে উঠতে লাগলেন; সেখানে একটি ছোট্টো কামরায় ব্যবস্থা ক'রে তাঁর কুকুরদুটিকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো।

যা ভেবেছিলেন, তাই। নেপচুন নামে কুকুরটি সেখানে ব'সে করুণ গলায় ডাকছে, আর সাটেলাইট অসাড় হ'য়ে তার পায়ের কাছে প'ড়ে রয়েছে।

বার্বিকেন চেঁচিয়ে জানালেন, 'ঐ কান্নাটা আর কিছুই না, নেপচুনের চিৎকার। দেখে মনে হচ্ছে সাটেলাইট আহত হয়েছে, তাই ও ঐভাবে চ্যাচাচ্ছে।'

উল্কাটার সঙ্গে সংঘাত না ঘটলেও উল্কাটা গোলকের পাশ দিয়ে ভীষণ বেগে ছুটে চ'লে গিয়েছিলো ব'লে গোলকটি যখন দারুণ-ভাবে থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিলো, তখন সাটেলাইট ছিটকে প'ড়ে কোনো-কিছুর সঙ্গে আহত হয়েছে বোধহয়।

সাটেলাইটকে ধরাধরি ক'রে মেঝেয় ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন বার্বিকেন। কিন্তু তার অসাড় শরীরে প্রাণের কোন স্পন্দন পাওয়া গেলো না। বেশ কিছুক্ষণ আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

কিছুক্ষণ আগেও, যখন উল্কাটার সঙ্গে সংঘাত ঘটতে যাচ্ছিলো, যখন বাঁচবার কোনো আশাই ছিলো না, তখনো আর্দা ঠাট্টা ক'রে মৃদু হেসে কথা বলেছিলেন; বলেছিলেন, 'বিজ্ঞানের শহীদ হিশেবে অমর হ'তে যাচ্ছি আমরা, এখন তো আমাদের দস্তুরমতো আনন্দ করা উচিত!' সেই সৌম্য, প্রফুল্ল ফরাশি ভদ্রলোকের চোখ এখন সজল ও ঝাপশা হ'য়ে এলো। কাঁপা গলায় তিনি কেবল বললেন- 'বেচারি সাটেলাইট!'

কিন্তু ও-ভাবে মুহ্যমান থাকবার মতো সময় তখন ছিলো না। বার্বিকেন জিগেস করলেন, 'এখন তাহ'লে কী করা যায়? পৃথিবী ও

চন্দ্রলোকের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে কী ক'রে স্যাটেলাইটকে সমাধি দেবো আমরা ?'

'তাইতো !' ঘাড় চুলকোলেন নিকল : 'কী করা যায় কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

খানিকক্ষণ সকলেই নির্বাক হ'য়ে রইলেন, শেষটায় আর্দা বললেন, 'মেঝের ঐ ধাতুর ঢাকনিটা খুলে স্যাটেলাইটকে ফেলে দিলে হয়। এতো উপর থেকে পৃথিবীতে প'ড়ে ওর হাড়গোড় যদি একটুও অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে কেউ একজন দেখতে পেয়ে সেগুলো কবর দেবার ব্যবস্থা করবে নিশ্চয়ই।'

বার্বিকেন ধাতুর ঢাকনিটা খুলে ধরলেন। 'শিগগির করুন, না-হ'লে এই ফাঁক দিয়ে সব অক্সিজেন নষ্ট হ'য়ে যাবে !'

মহাশূন্যের সহচর স্যাটেলাইটকে এভাবে শূন্যে নিক্ষেপ করবার সময় অধ্যাপক আর্দার হাতদুটি কেঁপেছিলো বৈকি !

৫

কয়েক মিনিট পর জানলা দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে বার্বিকেন বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে আমাদের আকাশ-যানটির গতিবেগে কিংবা গতিপথে কিছু-একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমার হিশেব-মতো এখন আমাদের চাঁদের আরো কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিলো।'

'সত্যিই কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে?' উদগ্রীব হ'য়ে আর্দা জিগেস করলেন।

বার্বিকেন উত্তর করলেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, ভয় হচ্ছে, একটা-কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়ই!'

টেলিস্কোপে চোখ রেখে বাইরে দৃষ্টিপাত করলেন আর্দা, এবং তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, আরে! ওটা কী জিনিশ দেখুন তো!'

'দেখি, দেখি,' বলে বার্বিকেন সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। 'এই টেলিস্কোপটা যদি আমাদের নিশ্চিত কোনো খবর দিতে পারে, তবে তো ভালোই।'

টেলিস্কোপের ফুটোয় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সবিস্ময়ে বার্বিকেন দেখলেন, মহাশূন্যের নক্ষত্রমালার মধ্যে একটি কুকুর, এবং সেটি একটি নক্ষত্রকে কেন্দ্র ক'রে বন্‌বনিয়ে ঘুরছে। 'আরে! এ যে আমাদের স্যাটেলাইট! বুঝেছি ব্যাপারটা। ওর তো নিজস্ব কোনো গতিবেগ নেই যা ওকে ধাবমান করতে পারে, সেই কারণেই ওকে নিকটবর্তী নক্ষত্রের চারপাশে এভাবে ঘুরতে হচ্ছে। আমাদের আকাশ-যানের মতোই ও চাঁদের এতোটা নিকটবর্তী নয় যে তার মাধ্যাকর্ষণের টানে চাঁদে গিয়ে পৌঁছুবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণও এখন ওকে টানছে না। তাই কাছাকাছি যে-নক্ষত্র ছিলো তারই

মাধ্যাকর্ষণে প'ড়ে এখন তাকে কেন্দ্র ক'রেই ওকে ঘুরতে হচ্ছে।'

এমনি সময় আচমকা নিকলের অবাক গলা শোনা গেলো :
'আরে, এ কী কাণ্ড! দেখুন, দেখুন—আমার দুরবীনটা শূন্যে
ভাসছে!'

এমন আজগবি খবর শুনে তক্ষুনি সবিস্ময়ে ফিরে তাকালেন
আর্দা ও বার্বিকেন।

একটু লক্ষ্য ক'রে ব্যাপারটা বার্বিকেন ব্যাখ্যা করলেন, 'বুঝতে
পেরেছি। আমরা এখন মহাশূন্যের এমন এক রহস্যময় এলাকায়
প্রবেশ করেছি যেখানে আমাদের উপর পৃথিবী আর চাঁদ—কারুর
মাধ্যাকর্ষণই জোর খাটাতে পারছে না। এখন আমরা চাঁদ আর
পৃথিবী—উভয়ের অভিকর্ষেরই নাগালের বাইরে।'

মাধ্যকর্ষণ কাকে বলে, সে-জিনিশটা এবারে স্পষ্ট ক'রে বুঝে
নেয়া যাক।

এ-কথা সকলেই জানে যে পৃথিবী গোল, অবশ্যি পুরোপুরি
গোল নয়, উত্তরে ও দক্ষিণে সামান্য পরিমাণে চাপা। এই চাপা
অংশটি এতোই সামান্য যে পৃথিবীকে গোলাকার বললে বিশেষ
ভুল করা হয় না। সেইসঙ্গে এ-কথাও সকলেই জানে যে মেরু-
রেখাকে অক্ষ ক'রে পৃথিবী অতি প্রচণ্ডবেগে সর্বদাই লাটিমের
মতো বন-বন ক'রে ঘুরছে। সেই ঘূর্ণমান পৃথিবীর উপর
মানুষের বাস।

একটা পাঁক-মাখা বল যদি ভীষণবেগে ঘুরোনো যায়, তাহ'লে
বলটার গা থেকে চারদিকে পাঁক ছিটকে পড়বে। কিন্তু এই গোল
পৃথিবী এতো জোরে অনবরত ঘোরা সত্ত্বেও তার উপর থেকে আমরা
ছিটকে পড়ি না কেন?

পড়ি না মাধ্যাকর্ষণের জন্য, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার অন্য
নাম হ'লো অভিকর্ষ। সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে,
এই অভিকর্ষ হ'লো টেনে রাখার জোর। ছুঁড়ে ফেলবার যে জোর,

তার নাম কেন্দ্রাতিগ শক্তি : তার চেয়ে এই টেনে রাখার জোরের,—অর্থাৎ অভিকর্ষের ক্ষমতা বেশি। এবং এই কারণেই আমরা পৃথিবীর উপর থাকতে পারছি. নইলে কোনকালে যে কোন শূন্যে ছিটকে পড়তুম, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অভিকর্ষের আকর্ষণ পৃথিবীর সবখানে, ছোটো-বড়ো সকল জিনিশেই আছে : প্রত্যেক জিনিশ প্রত্যেক জিনিশকে আকর্ষণ করছে। শুধু পৃথিবী কেন, এই সৌর জগতের সমস্ত জড় পদার্থে এই আকর্ষণ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে : সেই কারণে অনেকে একে 'মহাকর্ষ'ও ব'লে থাকেন।

মহাকর্ষের কাজ-কারবার যে যে কানুন ধ'রে চলে, সেই আইন-কানুনগুলো প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন নিউটন। ছুটো জিনিশের মধ্যে পারস্পরিক টানের জোর জিনিশছুটির ভারের উপর নির্ভর করে ; তাছাড়া জিনিশছুটি নিকটতর হ'লে টানের জোর বাড়বে, ব্যবধান বাড়ালে সেই জোর ক'মে যাবে। অর্থাৎ আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় ছুটি জিনিশের ভার অনুযায়ী . আর, ছুটি জিনিশের মধ্যে তফাৎ যতো বাড়ে টেনে রাখার জোর কমে তার বর্গ-গুণ, এবং তফাৎ যতোগুণ ক'মে আসে টেনে রাখার জোর বাড়ে তার বর্গ-গুণ। মানে, দূরত্ব যতো বেশি, টেনে রাখার জোর তার বর্গ অনুসারে ততো কম। এই আইন-কানুনগুলি যে সত্য, এবং সর্বত্রই এর প্রভাব প্রসারিত,—তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। সমস্ত বিশ্বে—গ্রহে-উপগ্রহে—চুম্বকের মতো এই মহাকর্ষ এই নিয়মেই কাজ ক'রে চলেছে।

এখন, বার্বিকেনদের গোলকটি মহাশূন্যের এমন এলাকায় এসে পৌঁছেছিলো যেখানে পৃথিবীর টান আর পৌঁছতে পারে না। আবার চাঁদ থেকেও তার দূরত্ব প্রচুর ব'লে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণও তার নাগাল ধরতে পারেনি।

এই মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে যে কী-সব কাণ্ড হ'তো, তা ব'লে ফুরোনো যায় না। আমরা যে কোন শূন্যে ছিটকে পড়তুম, তার

কোনো ঠিক-ঠিকানা থাকতো না। যা দেখে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেছিলেন, সে-কথাই ভাবা যাক। মাধ্যাকর্ষণ আছে ব'লেই ফল মাটিতে পড়ছে, না-থাকলে তাকে আর মাটিতে পড়তে হ'তো না, শূন্যেই ঝুলে থাকতে হ'তো ; বা, কেউ লাফ দিলে আর মাটিতে নামতো না, শূন্যেই উঠতে থাকতো, কেননা কোনো-কিছুই যখন টানছে না, তখন লাফাবার বেলায় যে-গতি সঞ্চারিত হ'তো তা বাধা পেতো না ব'লে কখনো ফুরোতো না, এবং ফুরোতো না ব'লে ক্রমাগতই উপরে উঠতে হ'তো। সবচেয়ে বড়ো কথা হ'লো, মাধ্যাকর্ষণ না-থাকলে কোনো-কিছুর কোনো ওজনই থাকতো না।

এবং মাধ্যাকর্ষণ না-থাকার দরুন বার্বিকেনদের সেই আকাশ-যানের মধ্যেও নানা অদ্ভুত, হাস্যকর ও বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি হ'তে লাগলো। বার্বিকেন তাড়াতাড়ি জানলার কাছে যাবার জন্যে পা তুলতেই একেবারে ছাতে উঠে ধাতুর ঢাকনায় এক ঘা খেলেন, ঘা খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গতি হ'লো নিম্নমুখী, সুতরাং পড়বি তো পড় একেবারে আর্দার গায়ে। কিন্তু সেখানেও স্থির হ'য়ে দাঁড়ানো গেলো না, আবার উঠতে হ'লো উপরে, শূন্যেই ঝুলতে লাগলেন তিনজনে। টেলিস্কোপটাও তেমনি ঝুলতে থাকলো।

আর্দা সেই শূন্যে-ঝোলা অবস্থায় থেকেই বললেন, 'আমরা এখন এমন এক অঞ্চলে এসে পৌঁছেছি যেখানে ওজনের আর কোনো বালাই-ই নেই।'

'আমাদের এই রোমাঞ্চকর অভিযানের এই পর্যায়ে পৌঁছে আমি কিন্তু যথেষ্ট খুশিই হয়েছি।' নিকল বললেন, 'কিন্তু এতোক্ষণে তো আমাদের চাঁদের আরো কাছাকাছি হবার কথা ছিলো। এ-কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না, কি জন্যে আমাদের সময়ের হিশেবে গণ্ডগোল হ'লো।'

'আমি কিন্তু সেটা এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছি।' বার্বিকেন জানালেন, 'আমাদের হিশেবে কোনো গণ্ডগোলই হয়নি। ঐ

সর্বনেশে ভয়ংকর উল্কাটাই এই কাণ্ডটা করে গেছে। উল্কাটা আমাদের গোলকের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার প্রচণ্ড গতির আড়োলনে আমাদের গোলকের গতিপথে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে গেছে।'

হঠাৎ নিকল আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাধ্যাকর্ষণের কিছুটা প্রভাব অনুভব করতে পারছি। তার মানে, চাঁদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি আমরা!'

যেই-না এই কথা শোনা, অমনি অধ্যাপক আর্দাঁ তাড়াতাড়ি জানলার কাছে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনো তো আর ভালো ক'রে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়ে নি গোলকে, তাই চক্ষের পলকে তিনি জানলার কাচে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। ব্যথা তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, কিন্তু অতো কাছ থেকে চাঁদ দেখবার আনন্দের মধ্যে ঐ তুচ্ছ আঘাত দৃকপাত করবার সময় কি তাঁর আর তখন আছে? ছোট্টো ছেলের মতো হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন তিনি, 'দেখুন! দেখুন! চাঁদ—আমাদের স্বপ্নের চন্দ্রলোক!'

বার্বিকেন রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল এ-কথাই বলতে পারলেন, 'তাহ'লে সত্যিই চাঁদে যাচ্ছি আমরা!'

অবশেষে দেখা গেলো আকাঙ্ক্ষিত উপগ্রহের ভূপৃষ্ঠ।

দেখা গেলো বিশাল গিরিমালা, সারি-সারি অগ্নিগিরি, অগ্ন্যুদ্‌গারের জন্য অসমতল এবড়োখেবড়ো চন্দ্রলোকের ত্বক। দেখা গেলো নদীর মতো দূরাভিসারী খাদ—নদীর মতোই মনে হ'লো, কেননা জল আছে কি না, দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো না।

পৃথিবীর ত্বক-সৃষ্টির ইতিহাসের প্রথম দিকে বার-বার বহু মন্থন, আলোড়ন, উদ্গীরণ, প্লাবন, কম্পন ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে। যুগের পর যুগ এইভাবে মন্থনের মধ্যে কেটে যাবার পর ভূত্বক ক্রমে ঈষৎ শান্ত হ'লে পরই এই পৃথিবী হয়েছে জীবধাত্রী। প্রাণীজগতে অভিব্যক্তির শেষ পর্যায়ে আবির্ভূত হয়েছে মানব জাতি—ভূতত্ত্ববিদদের মন্তব্য অনুযায়ী 'অতি-আধুনিক' যুগে। তারপর, মানুষের ঐতিহাসিক যুগ শুরু হবার পরেও ধরিত্রীতলে ভূকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কতো কাণ্ড হ'য়ে গেলো, যার কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পুরাণ এবং ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে। তবে সে-কালের সে-সব প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন, উদ্গীরণ, বন্যা প্রভৃতি—যার ফলে সমুদ্রতল থেকে বিশাল পর্বত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো, একেকটা গোটা মহাদেশ বিলীন হ'য়ে যেতো সমুদ্রে—তা আর হয় না, ত্বকের প্রাথমিক মোটামুটি শান্ত অবস্থা। অবশ্য একেবারে শান্ত এখনো হয়নি ভূত্বকের সংকোচন ও প্রসারণে সমুদ্রের প্রবল তুফান, অগ্নিগিরির তুমুল উদ্গার, ভয়াবহ ভূকম্পন—এমনকি নতুন স্থলভূমির সৃষ্টি পর্যন্ত—আজও সম্ভব। যুগের পর যুগ অসমান পদক্ষেপে পেরিয়ে এসে পৃথিবী আজ শ্যামলা ও সুফলা। পৃথিবীর সৃষ্টিমুহূর্তে যে ঘন-ঘন আলোড়নের কাল এসেছিলো, চাঁদের সৃষ্টি সেই সময়ে।

চাঁদ এখন কেমন, কে জানে? বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে যা-কিছু বলেন, তা তো মানমন্দির থেকে জ্যোতিষ্কমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। মূলত অনুমান-নির্ভর ব'লে তাঁদের ধারণায় ভুল হওয়া বিচিত্র নয়, বরং অনায়াসেই সম্ভব। এমনকি, ভুল যে হ'য়ে থাকে, তার দৃষ্টান্ত তো বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিতান্ত কম নয়।

সেই চাঁদের চেহারা দেখা গেলো, দেখা গেলো কাছ থেকেই। এখন আরেকটু কাছে যেতে পারলেই কেবল আন্দাজ-নির্ভর নয়, চাঁদ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। কিন্তু সেই পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হ'লে চাঁদে পা ফেলতে হবে সর্বপ্রথমে।

চাঁদের একটা গহ্বরের দিকে চোখ পড়লো বার্বিকেনের টেলিস্কোপে চোখ রেখেই তিনি বললেন, 'কোনো কোনো জ্যোতির্বিদের মতে চাঁদের গহ্বরগুলি চন্দ্রবাসীদেরই কীর্তি: চন্দ্র-বাসীরাই ও-সব খুঁড়ে দিয়েছে—এই হ'লো তাঁদের অভিমত'

আর্দা জিগেস করলেন, 'তাঁদের মতে ঐ গহ্বরগুলি কী জন্য খোঁড়া হয়েছে?'

'প্রখর সৌর তাপ এবং প্রচণ্ড শৈত্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য। মনে রাখবেন, একটি চান্দ্র দিন পৃথিবীর পনেরো দিনের সমান।'

হঠাৎ আর্দা বিস্মিত গলায় ব'লে উঠলেন, 'আরে! এ যে দেখছি চাষ-করা জমি!'

নিকল বললেন, 'যা দেখে আপনি চাষ-করা জমির কথা বললেন, আমার মনে হয় তা হ'লো আসলে শুকিয়ে-যাওয়া খাল-বিল।'

'আসল ফসলভরা জমি, গাছপালা বা বাড়ি-ঘর হয়তো ঐ-সব গহ্বরের ভিতর দেখতে পাওয়া যাবে,'—বার্বিকেন বললেন।

আর্দা বললেন, 'আপনার গবেষণা সত্যি কি না, তা শিগগিরই আবিষ্কার করার সৌভাগ্য আমাদের হবে ব'লে আশা করছি।'

হঠাৎ অন্ধকারে আকাশ-যানের অভ্যন্তর ভ'রে গেলো। তিন-জনেই একসঙ্গে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। নিকল বললেন, 'এবার আমরা চাঁদের অন্ধকার এলাকায় চলেছি। এবারে আমাদের আকাশ-যান চাঁদের ছায়াময় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।'

'তার মানে, চাঁদের যে-এলাকায় রাত, আমরা এখন সেই এলাকার দিকে চলেছি তো?—তাহলে তো মুশকিলের ব্যাপার, কেননা একটি চান্দ্র রাত্রি মানে তো পৃথিবীর পনেরো রাত!'

'তাপমাত্রা ক'মে যাচ্ছে,' বার্বিকেন আরেকটি নিদারুণ তথ্য জানালেন, 'আমার সাংঘাতিক শীত করছে!'

আর্দাঁ গ্যাসের ব্যবস্থা করতে যেতেই বার্বিকেন তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন: 'গ্যাস একটু কম ক'রে খরচ করবেন আমাদের ভাঁড়ারে গ্যাস কিছু বেশি নেই, তার উপর সরবরাহও সীমিত। যতোটুকু [illegible] নয়, তার বেশি একটুও খরচ করা চলবে না।'

'আকাশ-যানটির বর্তমান গতিবেগ আমাদের অচিরেই আবার চাঁদের দিবালোকিত অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দেবে।' আর্দাঁ বললেন, 'ততোক্ষণ গ্যাসের তাপের সাহায্যেই এই হাড়-কাঁপানো, রক্ত-জমানো কনকনে ঠাণ্ডার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।'

কিন্তু চন্দ্রলোকের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা কি আর গ্যাসের উত্তাপে বাধা মানে? বাইরে চাঁদের বুকে এর মধ্যেই তুষার-বর্ষণ শুরু হ'য়ে গেছে। গোলকের ভিতরে তিনজনে হী-হি ক'রে কাঁপতে লাগলেন। ব্যারোমিটারের পারদ সেই কখন শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে নেমে গেছে।

'হাড়ে-হাড়ে যেন ঠোকাঠুকি হচ্ছে!' আর্দাঁ গুটিশুটি মেরে বসবার চেষ্টা করলেন, 'ঠাণ্ডায় জ'মে যাচ্ছি একেবারে! শেষটা শীতেই না আমাদের মৃত্যু হয়—আমার সবচেয়ে বড়ো ভয় এইটেই।'

'কোনোরকমে সামলে-সুমলে থাকুন। তেমনি কাঁপতে-কাঁপতে বললেন নিকল, 'ধৈর্য ধরুন। শিগগিরই আমরা চাঁদের দিবালোকিত

অঞ্চলে পৌঁছবো। চাঁদের বুকে নামবার একটা ভালো জায়গাও পাওয়া যাবে তখন।'

বার্বিকেন বললেন, 'দিবালোকিত এলাকায় গিয়ে পৌঁছলেই কিন্তু আমাদের সব সমস্যা মিটে গেলো না। আমাদের পক্ষে সত্যিকার প্রয়োজনীয় হ'লো নিচের দিকে—মানে চাঁদের দিকে—নামা। চাঁদের চারপাশে এই সর্বনেশে ঘোরা ঘুরে লাভ কী? আমরা যদি না-থেমে এইভাবেই আবর্তন শুরু করি, তাহ'লে তার প্রচ্ছন্ন অর্থ কী হ'য়ে ওঠে, বুঝতে পারছেন তো? এখন আমরা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের পাল্লায় এসে পৌঁছেছি। সুতরাং আমরা যদি কোনো রকমে চাঁদের বুকে অবতরণ করতে না-পারি তো সাটেলাইটের মতো আমাদেরও মহাশূন্যে চিরকাল চাঁদকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে হবে। সেটা যাতে না-হয়, সেজন্যে আগেভাগেই আমাদের যা-হোক একটা কিছু করতে হবে।'

নিকল আর আর্দা দু-জনেই একসঙ্গে সচমকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন—'

'হ্যাঁ, আপনারা যা ভাবছেন, সে-কথাই বলতে চাচ্ছি আমি। শেষ পর্যন্ত এই না আমাদের বরাতের ফের হ'য়ে ওঠে!'

যদি বার্বিকেনের ধারণা সত্যি হয়, তাহ'লে চিরকালের জন্যে গোলকটিকে চন্দ্রলোকের চারদিকে বৃত্তাকারে আবর্তন ক'রে চলতে হবে। কোনোদিন চাঁদেও পৌঁছতে পারবে না, আবার দূরেও স'রে যেতে পারবে না—যুগের পর যুগ এইভাবেই বন-বন ক'রে ঘুরে মরতে হবে।

'আমরা সঠিক কখন জানতে পারবো আমাদের আশাহীন ভবিষ্যৎকে?' ব্যগ্র গলায় আর্দা জিগেস করলেন।

'যখন আমরা দিবালোকিত অঞ্চলে প্রবেশ করবো, তখনই আমাদের বরাত আপনিই প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে। দিবালোকিত এলাকায় প্রবেশ করবার আগে যদি আমরা চাঁদের নিকটতর না-হই, তাহ'লে মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

রুদ্ধ নিশ্বাসে সময় কাটতে লাগলো। সমস্ত মগজ জুড়ে কী-এক অসহ্য চাপ নেমে এলো যেন, আর তাই গোনা গেলো না, শোনা গেলো না নিশ্বাসগুলি। এক অনাগত অথচ দ্রুতধাবমান অশুভ মুহূর্তের কালো ইঙ্গিত যেন দুঃসহ স্পর্ধায় এগিয়ে আসছে! নিষ্পলক চোখে তিনজনে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতো। কিন্তু সময় যেন আর চলতে চাচ্ছে না, সেও যেন তাঁদেরই মতো স্থাণু হ'য়ে গেছে।

এইভাবে তিনঘণ্টা কাটলো, অথচ তাঁদের মনে হ'লো, কাটলো যেন তিন শতাব্দী।

হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে নিকল জিগেস করলেন, 'আমরা কি আবার দিবালোকিত অঞ্চলে প্রবেশ করতে চলেছি?'

আর্দা শুধোলেন, 'তাহ'লে সত্যিই চাঁদে নামতে পারবো না আমরা?'

বার্বিকেন টেলিস্কোপের ফুটোয় আগ্রহী চোখ রাখতে-রাখতে বললেন, 'ভালো করে দেখে এক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের ভাগ্যফল ঘোষণা করতে পারবো ব'লে আশা করছি। চাঁদের বুকে আমাদের পায়ের ছাপ পড়বে কি না, এক মুহূর্তের মধ্যেই তা জানাচ্ছি।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই গম্ভীর মুখে টেলিস্কোপের ফুটো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন বার্বিকেন। ভারি গলায় ঘোষণা করলেন দুর্ভাগ্যকে: 'দুঃখিত। আর আমাদের রেহাই নেই। যতোক্ষণ না মৃত্যু এসে আমাদের মুক্তি দিচ্ছে, ততোক্ষণ চাঁদের উপগ্রহ হিশেবে চাঁদকে আবর্তন ক'রে ঘুরতে হবে আমাদের। তীরের কাছে এসে নৌকোডুবি হবার যে-কটি নজির পৃথিবীতে আছে, আমাদের এই অভিযানও তাদেরই একটি হ'লো এবারে। নিজেদের বাঁচাবার শক্তি আর আমাদের নেই।'

বিমূঢ় অভিযাত্রীদের মধ্যে নিরেট স্তব্ধতা নেমে এলো। কোনো

কথা বলবার মতো শক্তি পাচ্ছিলেন না কেউ। চুপচাপ তিনজনে দাঁড়িয়ে রইলেন স্পন্দন-রহিতের মতো।

আচমকা লাফিয়ে উঠলেন আর্দাঁ। 'আমাদের হাউইগুলো ব্যবহার করা যায় না এখন?'

'হাউইগুলো তো আনা হয়েছে চাঁদে নামবার সময় গোলকের গতিবেগ কমাবার জন্যে।' নিকল ভারি গলায় জানালেন।

'হাউইগুলোর ক্ষমতা যে সুপ্রচুর, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় চিরকালের-জন্যে-শুরু-হওয়া এই আবর্তন ব্যাহত করতে হাউইগুলো আমাদের সাহায্য করতে পারে।'

'কিন্তু তাহ'লে আমরা চাঁদে নামবো কী ক'রে? এখনই যদি হাউইগুলো আমরা ব্যবহার করি, তাহ'লে চন্দ্রলোকে অবতরণ করতে পারবো না আমরা।'

'এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে অন্য যে-কোনো কিছুই নিঃসন্দেহে ভালো।' বার্বিকেন আর্দাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়ে বললেন।

হাউইগুলো যেখানে ছিলো, তক্ষুনি সেখানে গিয়ে হাজির হলেন তিনজনে। জড়ো-করা হাউইগুলোর উপরকার ধাতুর ঢাকনা উন্মোচন ক'রে বার্বিকেন নির্দেশ দিলেন, 'তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে অগ্নি-সংযোগ করুন।'

দেশলাই জ্বালতে-জ্বালতে আর্দাঁ বললেন, 'বৎস হাউইবৃন্দ! তোমরা যদি খানিকটা অনুগ্রহ ক'রে বিস্ফোরিত হও, তাহ'লে আমরা চাঁদে অবতরণ করতে পারি। আশা করি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার অবকাশ তোমরা দেবে।' এই ব'লে সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলেন তিনি।

চক্ষের পলকে ধাতু-নির্মিত ঢাকনিটা বার্বিকেন বন্ধ ক'রে দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে গোলকটি প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো: ছিটকে পড়তে পড়তে আর্দাঁ চ্যাঁচালেন, 'হাউইবৃন্দের প্রস্থান! নতুন দৃশ্য আরম্ভ হবে এবার!'

শক্তিশালী হাউইগুলো বিস্ফোরিত হ'য়ে সেই বৃত্তাকার মৃত্যুমুখী কক্ষপথ থেকে মুক্ত ক'রে দিলো গোলকটিকে।

হাউইয়ের বিস্ফোরণের দরুন গোলকের ভিতর ডিগবাজি খেতে-খেতে বার্বিকেন বললেন, 'তাহ'লে সত্যিই আমরা সৌভাগ্যবান!'

'আমরা কি চাঁদে নামছি?' আর্দাঁ জিগেস করলেন।

কোনোরকমে নিজেকে সামলে জানলার দিকে এগোতে-এগোতে নিকল বললেন, 'এক মিনিট! ··আমার ভয় হচ্ছে আমরা হয়তো-বা চন্দ্রলোকে অবতরণ করছি না।'

'অ্যাঁ! তার মানে?'

'আমাদের গোলাটি পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে!'

সচমকে কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন বার্বিকেন, 'পৃথিবীর দিকে ছুটে চলেছে!'

৭

এস. এস. সাসকুয়েহানা যুক্তরাজ্যের বড়ো জাহাজগুলির অন্যতম।

জাহাজটি একটি গুরুতর কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ করছিলো। যুক্তরাজ্য থেকে হাওয়াই দ্বীপে 'টেলিগ্রাফ-কেবল' দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করবার একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যুক্তরাজ্যের সরকার। সেইজন্য এস. এস. সাসকুয়েহানার উপর ভার পড়েছে হনলুলু এবং সানফ্রান্সিসকোর মধ্যবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরের জলের গভীরতা পরিমাপের। সেই দায়িত্ব নিয়েই প্রশান্ত মহাসাগরে এস. এস সাসকুয়েহানার এই অভিযান।

ডেকে দাঁড়িয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। অন্যান্য নাবিকেরা তখন জলের গভীরতা পরিমাপে ব্যস্ত।

ক্যাপ্টেন জিগেস করলেন, 'এখানে জল কতো গভীর, এখনো কি সেটা মাপা গেলো না?'

সহকারী জবাব দিলেন, 'তিন হাজার পাঁচশো আট ফ্যাদম পর্যন্ত পাঠ নেয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত জলের নিচে পৌঁছনো যায়নি।'

'আমার মনে হচ্ছে এই এলাকাটাই সারা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে গভীর।'

'জলের এতো তলায় যে-জীবন, তা নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকের মতোই বিস্ময়কর!'

'চন্দ্রলোকের কথা বলছো?' ক্যাপ্টেন বললেন 'আমার খুব অবাক লাগছে! বাল্টিমোর গান-ক্লাবের সেই দুঃসাহসী তিন বন্ধু কোন চন্দ্রলোকে যে যাত্রা করলো, সে-কথা ভেবে আমি বিস্ময় বোধ করছি!'

তাঁদের আলাপে বাধা দিয়ে হঠাৎ একজন নাবিক চেঁচিয়ে উঠলো, 'আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন ক্যাপ্টেন!'

কথা শেষ হ'তে না-হ'তেই বার্বিকেনের গোলক প্রচণ্ডবেগে এসে জলের উপর আছড়ে পড়লো, এবং চক্ষের পলকে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে জাহাজটা তীব্রবেগে চর্কির মতো একবার ঘুরপাক খেয়ে নিলো।

জাহাজের রেলিং ধ'রে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিতে-নিতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভাখো হে, তোমার চন্দ্রলোকযাত্রীরা পৃথিবীর ভূমিতে অবতরণ করলেন!'

ডেকের উপর আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে-করতে সহকারী ক্যাপ্টেন বললেন, 'ঠিক ভূমিতে নয়, সাগরের জলে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রযাত্রীদেব খোঁজে একটি অন্বেষণ-বাহিনী বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু ঘণ্টা-কয়েক পরে আশেপাশের সমস্ত সমুদ্র আঁতিপাঁতি ক'রে খুঁজেও কোনো কিছুর চিহ্ন দেখতে না-পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হ'লো তাদের। ক্যাপ্টেন যখন শুনলেন চন্দ্রযাত্রীদের কোনো পাত্তাই নেই, তখন নির্দেশ দিলেন: 'সন্ধে পর্যন্ত তো সতর্ক চোখে খোঁজো কোথায় তারা গেলো, তখনো না-পাওয়া গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

কিন্তু খামকাই এই খোঁজাখুঁজি। সন্ধে হ'য়ে এলো, তবু তাঁদের কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। শেষকালে সহকারী ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করলেন, 'এখানকাব অক্ষাংশ, দ্রাঘিমারেখা—সবই তো আমরা জানি, সুতরাং আবার আমরা এখানে ফিরে আসতে পারবো। এখন বরং তাড়াতাড়ি জাহাজ সানফ্রান্সিকোয় নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে খুলে বলি। মনে হয়, তাহ'লে আমরা বড়োশড়ো একটি অন্বেষণ-বাহিনী, অর্থাৎ রীতিমতো একটা বহর সমেত এখানে ফিরে আসতে পারবো।'

ক্যাপ্টেন রাজি হলেন এ-প্রস্তাবে : 'চমৎকার ফন্দি ঠাউরেছো। আমি এক্ষুনি তাড়াতাড়ি সানফ্রান্সিসকো যাবার ব্যবস্থা করছি। এর মধ্যে, চন্দ্র থেকে এই অদ্ভুত প্রত্যাবর্তনের প্রচণ্ড আঘাত খেয়েও আমাদের বন্ধুরা যদি মারা না-পড়ে থাকেন তো—আমি নিশ্চিত জানি, তাঁদের সঙ্গে যে অক্সিজেন আছে তার সাহায্যে তাঁরা জলে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবেন।'

তক্ষুনি ক্যাপ্টেন অতি দ্রুতবেগে সানফ্রান্সিসকো রওনা হবার ব্যবস্থা করলেন। বেতার-যন্ত্রের অভাববশত এস. এস. সাসকুয়েহানার তরফে এ ছাড়া অন্য কিছু করণীয় ছিলো না।

ওদিকে তখন সাগরের নিচে নোঙরহীন নৌকোর মতো কিছুক্ষণ সবেগে ঘুরপাক খেয়ে সেই বিরাট গোলকটি প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে কতো যুগের জন্যে বন্দী হ'য়ে রইলো, কে জানে ?

সানফ্রান্সিসকোর জেটিতে দাঁড়িয়ে একটি নাবিক লাল আর সবুজ পতাকা নাড়ছিলো। নাবিকটির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন উঁচু-গোছের কর্মচারী। দূরে, দিগন্তে তখন একটা জাহাজ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিলো।

'কী ব্যাপার হে? হঠাৎ যে একটা জাহাজ আসছে এদিকে? এ-রকম সময়ে তো এখানে কোনো জাহাজ আসবার কথা নয়!'

'এস. এস. সাসকুয়েহানা ফিরে আসছে।' সসম্ভ্রমে নাবিকটি জানালো, 'জাহাজ থেকে সংকেত ক'রে এই কথা বলছে যে তারা সেই দুঃসাহসী চন্দ্রযাত্রীদের সাক্ষাৎ পেয়েছে!'

'অ্যাঁ! সত্যি নাকি?'

একটু পরেই এস. এস. সাসকুয়েহানা তীরে এসে ভিড়লো। এক মুহূর্তও অপেক্ষা না-ক'রে ক্যাপ্টেন তাঁর সহকারীকে নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চললেন। খবরের গতিবেগ যে হাওয়ার চেয়েও বেশি, তার প্রমাণ দেবার জন্যই বোধহয় ইতিমধ্যে জাহাজটির চারপাশ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গিয়েছিলো।

সানফ্রান্সিসকোর অ্যাডমিরাল ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনে বললেন, 'এই সংবাদ সরবরাহের জন্য অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের। আমরা এক্ষুনি সমর-বিভাগকে খবরটা জানাচ্ছি; তাঁরা প্রেসিডেন্টকে জানাবেন। শিগগিরই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।'

নম্রস্বরে সহকারী ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু তাতে তো অনেক দেরি হ'য়ে যাবে। আপনি বরং এক্ষুনি বাল্টিমোর গান-ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিতে পারেন।'

'ঠিক কথা।' সহকারী ক্যাপ্টেনের কথায় সায় দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এই বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে তলিয়ে-যাওয়া গোলকটিকে কেউ যদি খুঁজে বার করতে পারে, তবে সে গান-ক্লাবের সদস্য ছাড়া আর কেউই না।'

চারদিন পর গান-ক্লাবের সম্পাদক ম্যাটসনকে সানফ্রান্সিসকোর জেটিতে সাসকুয়েহানার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেলো।

ম্যাটসন বলছিলেন, 'ক্যাপ্টেন, যদি আপনি অভিযাত্রীদের সমুদ্রতলের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে চান, তবে আপনাকে জলের তলা থেকে খুব ভারি জিনিশ তোলবার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখবেন, গোলকটির ওজন ভীষণ।'

সেই বিরাট অন্বেষণ-কাজের প্রস্তুতি শিগগিরই শুরু হ'য়ে গেলো। ঘুরে-ঘুরে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম দেখতে-দেখতে ম্যাটসন বলছিলেন, 'আমি আশাবাদী, ক্যাপ্টেন। আমি এখনো আশা করি, তিনজনেই বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁরা কোন গল্প বলবেন দেখা হ'লে, সেটা আন্দাজ করা আমার কল্পনায় কুলোচ্ছে না।'

একটা বিরাট ডুবুরি-কামরা তোলা হয়েছিলো সাসকুয়েহানার উপর, যাকে নাবিকদের পরিভাষায় 'বয়া' বলে। ডুবুরি-কামরা কাকে বলে, তার একটা আন্দাজ থাকা দরকার। সমুদ্রতল সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের এই ডুবুরি কামরায় ক'রে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রতে হয়। এর ভিতরে দু-তিনজন মানুষ থাকবার ব্যবস্থা করা আছে। একে অনেকটা কামানের গোলার মতো দেখায়। এর ভিতরে অক্সিজেন, সন্ধানী-আলো প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিশের বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে। এর ভিতরে ঢুকে যাঁরা সাগরের অভ্যন্তরে যাবেন, তাঁরা ভিতরে ঢুকলে পর বাইরে থেকে দরজায় খুব ভালো ক'রে কুলুপ এঁটে দেয়া হয়। এই

কামরায় পুরু এবং শক্ত বিশেষভাবে তৈরি এক ধরনের কাচের জানলা থাকে। সন্ধানী-আলোর সাহায্যে কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টিপাত ক'রে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রতলের খবর সংগ্রহ করেন। ক্যামেরার সাহায্যে এই ডুবুরি-কামরার ভিতর থেকে সমুদ্রগর্ভের ফোটোও তোলা যায়। এই কামরার ভিতর থেকেই ম্যাটসন সমুদ্রের নিচে গান-ক্লাবের গোলকটির সন্ধান করবেন।

ধীরে-ধীরে সমস্ত জোগাড়যন্ত্র সমাধা হ'তেই ম্যাটসন ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'আর তো দেরি করা চলে না। চার-পাঁচ দিন কেটে গেলো বৃথাই। আপনি এবার তাড়াতাড়ি রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

তাঁর আর তর সইছিলো না। অবশ্য এমন অবস্থায় পড়লে কেই-বা খামকা সময় নষ্ট করতে চাইতো?

একটু পরেই অন্বেষণ-বহর রওনা হ'য়ে পড়লো। প্রশান্ত-মহাসাগরের সুনীল জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে ঘটনাস্থল অভিমুখে দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো এস. এস. সাসকুয়েহানা।

৯

ম্যাটসনের সঙ্গে ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সহকারী।

ম্যাটসন সহকারী ক্যাপ্টেনকে বলছিলেন, 'আমার বিশ্বাস আপনি সমুদ্রতলে আমার সহযাত্রী হচ্ছেন।'

সানন্দে সম্মতি জানালেন সহকারী। 'খুব রাজি। এটা ঠিক আমার মনের মতো কাজ।'

সমুদ্রের যেখানটায় গান-ক্লাবের গোলকটা ডুবে গিয়েছিলো, যথাসময়ে সাসকুয়েহানা সেখানে এসে পৌছলো।

ম্যাটসন বললেন, 'এখান থেকেই ডুবুরি কামরায় ক'রে অন্বেষণ শুরু করবো, ক্যাপ্টেন। আপনি তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করুন।'

ডুবুরি-কামরার ভিতরকার সাজসরঞ্জাম, অক্সিজেন, সন্ধানী আলো প্রভৃতি ঠিক আছে কি না ভালো ক'রে পরীক্ষা করা হ'লো। আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ম্যাটসন এবং সহকারী ক্যাপ্টেন ডুবুরি-কামরায় ঢোকার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলেন। তার আগে ক্যাপ্টেন শুভেচ্ছা জানালেন ম্যাটসনকে, 'আমার শুভকামনা জানবেন। আশা করি আপনার সুযোগ্য বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাবেন অচিরেই।'

ম্যাটসন এবং সহকারী ক্যাপ্টেন ডুবুরি-কামরার ভিতরে প্রবেশ করবার পর ক্যাপ্টেন দরজাটা বন্ধ ক'রে ভালো ক'রে কুলুপ এঁটে দিলেন। তারপর দু'জনে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে নামলেন নিখোঁজ বন্ধুদের সন্ধানে।

নীল সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশ সন্ধানী আলোর তীব্র রশ্মিতে আলোকিত হ'য়ে উঠলো।

সমুদ্রতলের জমিটা কী-রকম? নদীর জলের নিচে যেমন কাদা-

মাটি-বালি ইত্যাদি আছে, সমুদ্রের নিচেও কি তাই? এ-প্রশ্নের উত্তর কিন্তু নেতিবাচক, কেননা কাদা-মাটি-বালি তো নদীর দু-পাড় থেকে ধুয়ে ব'য়ে-আনা সামগ্রী। সমুদ্রের বালিই কেবল সেই-মতো; তীরবর্তী জমি পাথর ভেঙে ধুয়ে তার সৃষ্টি। কাজেই তীরের নিকটবর্তী অঞ্চলে কিছু-কিছু বালি পাথর পাওয়া যায়। ঐসব ভাঙা পাথর ও বালি দিয়ে উপকূলের কাছাকাছি এলাকার সমুদ্রতলের গহ্বরগুলি ভর্তি থাকে। উপকূল থেকে দূরে—গভীর সমুদ্রে—আর পাথর বা বালি নেই; সেখানে সমুদ্রগর্ভ এক ধরনের শাদা গুঁড়ো জিনিশে ঢাকা, নানারকম সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষে যার সৃষ্টি। শামুক আর ঝিনুকই কেবল নয়, আরো নানা জাতের শক্ত-খোলাওলা প্রাণী সমুদ্রতলে বাস করে। সেইসব প্রাণীর দেহাবশেষ যুগের পর যুগ ধ'রে সেখানেই জমা হচ্ছে। তাছাড়া সমুদ্রের অগভীর জলেও অনেকরকম ছোটো আকারের প্রাণী থাকে, যাদের দেহাবশেষ হাজার-হাজার বছর ধ'রে নিচে পড়ছে। এইসব পদার্থের একটি পুরু ও কঠিন আবরণে গভীর সমুদ্রগর্ভ আচ্ছাদিত। এছাড়া সমুদ্রতলে অনেক সহস্র বর্গমাইল ধ'রে একধরনের লাল মাটির আচ্ছাদন থাকে। অনেকের মতে, এর সৃষ্টি হয়েছে কোনো সামুদ্রিক অগ্নিগিরির উদ্গার থেকে। সমুদ্রগর্ভের আচ্ছাদন যা-ই হোক, আসলে সমুদ্রতল পাথরের তৈরি।

পাথরের তৈরি তো এই পৃথিবীও। পৃথিবীও কতো বিচিত্র ধরনের বিভিন্ন রকমের প্রাণীর বাস। সমুদ্রতলেও তেমনি হাজার রকমের প্রাণী আছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাণীদের মতো তাদের বাসস্থান এবং আহারের ব্যবস্থা আছে সমুদ্রতলেই। পৃথিবীপৃষ্ঠের মতো সমুদ্রতলেও নানা ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। সমুদ্রগর্ভের এই বিচিত্র সংবাদ 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা এই অ্যাডভেঞ্চারটি প'ড়ে দেখতে পারেন।

ডুবুরি-কামরার ভিতর থেকে জলের তলায় বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পেলেন তাঁরা। কিন্তু তখন সে-বিষয়ে মাথা ঘামানোর মতো কোনো সময় ছিলো না। অন্য কোনো দিকে দৃকপাত না ক'রে তন্নতন্ন ক'রে তাঁরা চারপাশে গান-ক্লাবের গোলকটি খুঁজে বেড়ালেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। কিন্তু কোথায় সেই গোলক? সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

একে-একে পাঁচ ঘণ্টা কাটলো খোঁজাখুঁজিতে। কিন্তু তবু সেই নিরুদ্দেশ গোলকের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না। শেষকালে সহকারী ক্যাপ্টেন জিগেস করলেন, 'আমরা কি আপাতত ফিরে যাবো মিস্টার ম্যাটসন?'

'তাছাড়া কী-ই বা আর করা যায়?' ম্যাটসনের গলার আওয়াজ ক্ষুব্ধ শোনালো। 'বার্বিকেন বা অন্য কারো চুলের ডগাটিও দেখা গেলো না কোনোখানে। খামকা আর কী করবো এই সাগরের তলায়?' এই ব'লে সংকেতে জাহাজের উপরে ডুবুরি-কামরা উত্তোলন করবার নির্দেশ পাঠালেন তিনি।

ধীরে-ধীরে জাহাজের উপর ওঠানো হ'লো ডুবুরি-কামরাকে।

ক্যাপ্টেন সাগ্রহে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সহকারী ক্যাপ্টেন জানালেন, 'উঁহু, কোনো লাভ হ'লো না।'

'কী দুর্ভাগ্য!' আপশোশ করলেন ক্যাপ্টেন। 'এবার তাহ'লে জলের উপরেই তন্ন-তন্ন ক'রে একবার খুঁজে দেখা যাক।'

দিন পাঁচেক কেটে গেলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যার সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে, পাঁচ দিন তার কাছে পাঁচ শতাব্দী; আর হতাশার ক্রমাগত আঘাত খেয়ে খেয়ে একদিন তার আশারও শেষ হ'য়ে যায়।

ডেকের উপর দূরবীন হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাটসন এবং সহকারী ক্যাপ্টেন। ম্যাটসন বলছিলেন, 'আশ্চর্য! কোনো পাত্তাই নেই!

আমাদের কী তবে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে!'

সহকারী ক্যাপ্টেন আর কী সান্ত্বনা দেবেন। দূরবীন দিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন তিনি নীরবে। জল, কেবল জল। যেদিকে তাকানো যায়, মহাসমুদ্রের সুনীল জলরাশি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। আচমকা তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে! ঐ-যে দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

সচমকে ম্যাটসন শুধোলেন, 'কী! কী দেখতে পাচ্ছেন?'

'অস্পষ্ট একটা কী যেন দূরে ভাসছে!'

'সেটার উপরে আবার যুক্তরাজ্যের পতাকা উড়ছে পৎপৎ ক'রে! তাহ'লে ওটাই বোধহয় গান ক্লাবের গোলক, কারণ ঐ-ধরনের চেহারা তো কোনো জাহাজের নেই!'

মাইল-খানেক দূরে সমুদ্রবক্ষে অস্পষ্ট কী যেন একটি দেখা যাচ্ছিলো। তার উপর যুক্তরাজ্যের পতাকা, হালকা হাওয়ায় উড়ছে পৎপৎ ক'রে।

তক্ষুনি একটি নৌকো নামানো হ'লো সমুদ্রে। কয়েকজন নাবিককে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি ম্যাটসন রওনা হ'য়ে পড়লেন, সঙ্গে গেলেন সহকারী ক্যাপ্টেন। মুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে দূরবীনটা নামালেন না ম্যাটসন। নৌকোটা কিছুদূর এগোবার পরই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'পেয়েছি! পেয়েছি! গান-ক্লাবের গোলকটিই জলে ভাসছে!'

নাবিকেরা দ্রুতহাতে দাঁড় টেনে চললো।

'একটা কথা আমার মাথায় আসছে না মিস্টার ম্যাটসন। গোলকটা তো প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রে প'ড়েই ডুবে গিয়েছিলো। এর যা ওজন, তাতে তো এর আর ভেসে ওঠার কথা নয়, তা সত্ত্বেও এটা কী ক'রে ভেসে উঠলো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এ তো খুব সোজা ব্যাপার। জাহাজ কেন জলে ভাসে? নৌকো কেন জলে ভাসে?—ভাসে আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য। এবং

সেই একই কারণে এই গোলকটিও জলের উপর ভেসে উঠেছে।'

কথা বলতে-বলতেই গোলকটির কাছে গিয়ে পৌঁছলো নৌকো। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। আস্তে-আস্তে নৌকোর বুকেও ভারি স্তব্ধতা নেমে এলো। ম্যাটসন বললেন, 'জীবনের তো কোনো চিহ্নই নেই।—আশা করি সবাই জীবিত আছেন !'

ঢেউয়ের আওয়াজের সঙ্গে মিশে গিয়ে ম্যাটসনের গলা কী-রকম নিস্তেজ শোনালো।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে ম্যাটসন গোলকটির দরজা খুললেন। সানন্দ বিস্ময়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের। গোলকের ভিতর থেকে প্রশ্ন হ'লো, 'কী ব্যাপার মিস্টার ম্যাটসন ? ভালো তো ?'

'আপনারা ঠিকঠাক আছেন তো ?'

গোলক থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বার্বিকেন বললেন, 'খুব ভালো আছি। যাত্রার এই পর্বটা বেশ শান্তভাবেই উপভোগ করছিলাম আমরা।'

ধীরে-ধীরে নৌকোয় উঠলেন তিনজনে : গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন, ফরাশি বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক মাইকেল আর্দা এবং রিচমণ্ডবাসী ক্যাপ্টেন নিকল। সবার শেষে নৌকোয় এসে উঠলো তাঁদের প্রিয় সঙ্গী নেপচুন।

'আপনারা কি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ?'

'ভয় !' হো হো ক'রে হেসে উঠলেন বার্বিকেন : 'যখন কোনো মানুষ চিরকালের জন্য চন্দ্রের উপগ্রহ হবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় দু'লক্ষ অসহ্য মাইল ঘুরে বেড়ায়, তখন সে ভুলে যায় ভয় পেতে। ভয় শব্দটা কী ক'রে বানান করে ম্যাটসন ?'

॥ শেষ ॥